গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক ইতিহাস : সূচনা, অগ্রগতি ও বিবর্তন (১৯৪৩-১৯৬৫ খ্রিঃ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ራን

বিংশ শতাব্দীর তিন-চারের দশকে সারা বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রবল অত্যাচারের মধ্যেও শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা স্বর্গ থেকে ছিনিয়ে আনা আগুনের আলো নিয়ে মানুষকে পথ দেখিয়েছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব ছিল অনিবার্যভাবে ঐতিহাসিক। যদিও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সংঘের পরিচালন পদ্ধতি, পার্টি নির্দেশিত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বিভিন্ন সময়ে আদর্শগত ভ্রান্তি এসেছে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া থমকে গেছে, পরিসর ক্ষুদ্র হয়ে এসেছে।

এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের চর্চা এখনও সম্পূর্ণ নয়। এই অধ্যায়ে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের (১৯৪৩-৬৫) মধ্যে গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক ইতিহাসকে বিবৃত করব। যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনোত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট। পাশাপাশি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে গণনাট্য সংঘের যোগসূত্র স্থাপন করা হবে। আলোচ্য সময়কালে গণনাট্য সংঘ কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন না হওয়া সত্ত্বেও পার্টিনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের পর পুনর্গঠিত গণনাট্য সংঘ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ছত্রছায়ায় চলে আসে। তৎকালীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও গণনাট্য সংঘের নীতিগত অবস্থানকে বিচার করে আমরা আলোচনাকে চারটি কালপর্বে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম পর্ব : ১৯৪৩-১৯৪৮ খ্রিঃ।

দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৪৮-১৯৫০ খ্রিঃ।

তৃতীয় পর্ব : ১৯৫০-১৯৬২ খ্রিঃ।

চতুর্থ পর্ব : ১৯৬৩-১৯৬৫ খ্রিঃ।

প্রথম পর্বে গণনাট্য সংঘের সূচনা থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে স্বাধীনোত্তর সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির 'মিথ্যা স্বাধীনতা' নীতির প্রভাবে গণনাট্য সংঘে সংকট ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে উত্তরণের পরিকল্পনা বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় পর্বে পাঁচের দশক

জুড়ে সংঘের অগ্রগতির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘে ভাঙন ও পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পর্ব :

গণনাট্য সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন :

১৯৪৩ সালের ২২-২৫ মে মুম্বই-এ প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলনের শেষ দিনে অর্থাৎ ২৫ মে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য তার আগেই ১৯৪০ সালে মুম্বই-এ 'জননাট্য' তৈরি হয়েছিল। ১৯৪১-এ ব্যাঙ্গালোরে সিংহলি মহিলা অনিল ডি'সিলভার নেতৃত্বে 'পিপলস থিয়েটার' নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়। অনিল ডি'সিলভার আহ্বানে মারাঠী সাহিত্যিক অনন্ত কানেকার, নৃত্যশিল্পী মাদাম মানেকা, চিকিৎসা বিজ্ঞানী সাহিব সিং সোখেই, খাজা আহমেদ আব্বাস, বলরাজ সাহনি, দেব আনন্দ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ 'পিপলস থিয়েটার'-এর কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৩-এর শুরুতেই মালাবার, যুক্তপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশসহ বিভিন্ন রাজ্যে 'পিপলস থিয়েটার'-এর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।^১

'পিপলস থিয়েটার'-এর নাট্য প্রচেষ্টা উপনিবেশিক ভারতবর্ষের শহরকেন্দ্রিক স্থবির-ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির তুলনায় প্রগতিশীল হলেও রাজনৈতিক মতাদর্শগত শিল্পচেতনার স্বরূপকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেনি। তুলনায় বাংলায় প্রগতি লেখক সংঘ, ওয়াইসিআই, সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ, ফ্যাবিলেশিসের ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ অনেক বেশি স্পষ্ট ও উদ্দেশ্যমুখর ছিল। সব মিলিয়ে একটি সর্বভারতীয় সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণনাট্য সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সিপিআই-এর তৎকালীন সম্পাদক পি সি যোশীর ব্যক্তিগত উৎসাহ ও পরামর্শ এই আন্দোলনকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিল। তিনিই ছিলেন সমগ্র সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের প্রধান 'formulator'^২।

১৯৪৩ সালের মে মাসে মুম্বইয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। গণশিল্পীরা ছাড়াও বাংলা থেকে প্রায় ২৫ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন। বাংলা থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ, হীরেন মুখার্জি, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে, বিনয় রায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, দেবব্রত বিশ্বাস, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মণিকুন্তলা সেন, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিবারণ পণ্ডিত, টগর অধিকারী, দশরথলাল, সুজাতা মুখার্জি, সুপ্রিয়া মুখার্জি, সুনীল চ্যাটার্জি প্রমুখ।^৩

২৫ মে সকাল সাড়ে আটটায় মুম্বই-এর মাড়ওয়ারি বিদ্যালয়ে গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি। বাংলা, বোম্বে, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, মহীশুর, মালাবার প্রভৃতি প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন। বাংলার তরফ থেকে প্রতিবেদন পেশ করেন সোভিয়েত সুহৃদ সংঘের অন্যতম সংগঠক স্নেহাংশু আচার্য।⁸ সম্মেলনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হন অকমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা নারায়ণ মালহার যোশী বা এন এম যোশী। সাধারণ সম্পাদক হন অনিল ডি'সিলভা এবং যৌথ সম্পাদক হন বিনয় রায় ও কে টি চণ্ডী। কৃষক নেতা বক্ষিম মুখার্জি, শ্রমিক নেতা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, প্রগতি লেখক সংঘের সাজ্জাদ জহীর, ছাত্র ফেডারেশনের অরুণ বোস কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। সর্বভারতীয় কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন স্নেহাংশু আচার্য ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। বাংলার প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটিতে ছিলেন সুনীল চ্যাটার্জি, দিলীপ রায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে, বিনয় রায়।^৫

ওই দিন রাত ৯টায় দামোদর হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর শুরু হয়। সভাপতি হীরেন মুখার্জির বক্তৃতার পর মুম্বই ইউনিটের তরফ থেকে অনন্ত কানেকার রচিত ও নির্দেশিত ইংরেজি নাটক 'ব্লাড অ্যান্ড টিয়ার্স' নাটকটি অভিনীত হয়। মুম্বই ইউনিট আরও দুটি নাটক প্রযোজনা করে। চৈনিক নাট্যকার টিঙ লিঙের লেখা নাটক অবলম্বনে 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং' এবং খাজা আহমেদ আব্বাসের নাটক 'ইয়ে অমৃত হ্যায়'। বাংলা স্কোয়াড গণসংগীত ও তিনটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে। বিনয়

ঘোষের লেখা বাংলা শাখার 'ল্যাবরেটরি' নাটকটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায়। সমবেত সংগীত 'মজদুর হ্যা হাম'-এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।^৬

বিনয় ঘোষের লেখা 'ল্যাবরেটরি' নাটকটি গণনাট্যের প্রথম সম্মেলনে অভিনীত হওয়ার কিছুদিন আগেই কলকাতার নাট্যভারতী হলে ফ্যাবিলেশিসের প্রযোজনায় অভিনীত হয়। 'অরণি' পত্রিকার ২ বর্ষ ৩৭ সংখ্যায় (২১ মে, ১৯৪৩) নাটকটি প্রথম ছাপা হয়। পরবর্তীকালে বহুরাপী পত্রিকার ৩৩ তম সংখ্যাতে নাটকটি পুনর্মুদ্রিত হয়।^৭ নাটকের মূল কাহিনিটি ফ্রিডরিখ উলফের 'প্রোফেসর মামলক' থেকে অনুপ্রাণিত হলেও বিনয় রায় বাংলার পটভূমিতে নতুন চরিত্র সৃষ্টি করে মৌলিক রূপ দেন। গণনাট্যের সম্মেলনে অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান, বিজন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখার্জি প্রমুখ। বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'আগুন' নাটকটিও 'ল্যাবরেটরি'র সঙ্গে নাট্যভারতী হলে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩ সালের ২৩ এপ্রিল সংখ্যায়। গণনাট্য সম্মেলনের পর ২৮ মে মুম্বই-তে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'আগুন' নাটকটি পুনরায় অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে পার্টি কংগ্রেসের সভাপতি মগুলীর মধ্যে অন্যতম মণিকুন্তলা সেন 'ঝগড়াটে বৌ'-এর চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন।^৮

বাংলায় গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সাফল্য ও তার প্রভাব :

তিনের দশকের মাঝামাঝি থেকেই বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নবজীবনের সূচনা হলেও প্রকৃত অর্থে গণনাট্যের বুনিয়াদ তখনও তৈরি হয়নি। ২৯ জুলাই অনিল ডি'সিলভা বিনয় ঘোষকে চিঠি পাঠিয়ে বাংলার গণনাট্য কমিটিকে নতুন করে গড়ে তোলেন। সর্বক্ষণের সংগঠকের দায়িত্ব দেওয়া হয় সুধী প্রধানকে। সভাপতি হন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রযোজনা সম্পাদক শম্ভু মিত্র, সংগীত সম্পাদক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ চিন্মোহন সেহানবীশ।^৯ ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিট হল গণনাট্য সংঘের ঠিকানা। উল্লেখ্য যে সংগঠন পুনর্গঠিত হলেও বাংলায় গণনাট্য সংঘ তখনও ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অধীনেই কাজ করত।

বাংলা প্রদেশে গণনাট্য সংঘের প্রাথমিক কর্তব্য ছিল মম্বন্তরকে প্রতিরোধ করার জন্য পাবলিক রিলিফ কমিটির (পিআরসি) হয়ে অর্থসংগ্রহ করা। পিআরসি তৈরি হয়েছিল ১৯৪৩-র ২৯ সেপ্টেম্বর। আর নভেম্বর মাসে বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘের ক্ষোয়াড পাঞ্জাব ও দিল্লি সফরে বেরিয়ে পড়ে। এই দলে ছিলেন বিনয় রায়, নরেন ভট্টাচার্য, দশরথলাল, ঊষা দত্ত, সাধনা গুহ, ভূপতি নন্দী।^{১০} ভারতের বিভিন্ন স্থান মিলিয়ে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল বিনয় রায়ের কথায় ও সুরে সাধনা গুহের গান 'শুন হিন্দকে রহনেওয়ালো', বিনয় রায়ের একাঙ্কিকা 'ম্যায় ভুখা হুঁ', হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একাঙ্কিকা 'মুসাফির' প্রভৃতি।^{১১} দু-মাসের সফরে এঁরা পিআরসি-র জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

১৯৪৩ সালে 'আগুন' ও 'ল্যাবরেটরি' মঞ্চস্থ করার পর ১৯৪৪ সাল ছিল গণনাট্য সংঘের নাট্য-প্রযোজনার সাফল্যের বছর। ৩ জানুয়ারি গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় দুটি নাটক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা 'হোমিওপ্যাথি' এবং বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'জবানবন্দী'। 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা 'হোমিওপ্যাথি' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'অরণি' পত্রিকার ৫ নভেম্বর ১৯৪৩ সংখ্যায়। পরবর্তী কালে 'বহুরূপী' পত্রিকার ৩৩ সংখ্যায়, ১৯৬৯ সালে নাটকটি পুনর্মুদ্রিত হয়। 'অরণি' পত্রিকার ১৯৪৩ সালের ২৯ অক্টোবর সংখ্যায় বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'জবানবন্দী' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। শন্থু মিত্রের নির্দেশনায় প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন গঙ্গাপদ বসু, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, তৃপ্তি ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন বড়াল প্রমুখ। নেমিচাঁদ জৈন কর্তৃক 'জবানবন্দী'-র হিন্দি অনুবাদ 'অন্তিম অভিলাষ' বাংলার বাইরে প্রভূত জনপ্রিয়তা পায় এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার জন্য অর্থসাহায্য সংগ্রহ করে।^{১২} ১৯৪৪ সালের ১৫ জানুয়ারি 'ল্যাবরেটরি', 'হোমিওপ্যাথি', 'জবানবন্দী' তিনটি নাটক নিয়ে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে একটি বই প্রকাশ করা হয়। বইটির নাম ছিল 'তিনটি নাটিকা', দাম ১ টাকা।

বাংলায় গণনাট্য সংঘের দ্বিতীয় প্রকাশ্য সমাবেশ হয় ১৯৪৪ সালের ১৫-১৭ জানুয়ারি কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। দশটি জেলা থেকে প্রায় বারো হাজার মানুষ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে চব্বিশ পরগণা ও দিনাজপুরের ফুলবাড়ির কৃষক সমাবেশে গণনাট্য সংঘ সাফল্যের

সঙ্গে 'জবানবন্দী' নাটক মঞ্চস্থ করে। মার্চ মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের বেজওয়াড়ায় সারা ভারত কৃষক সভার অষ্টম সর্বভারতীয় সম্মেলনে বিনয় রায়ের নেতৃত্বে বাংলার গণনাট্য সংঘের ক্ষোয়াড অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে পানু পাল ও ঊষা দত্তের 'মহামারি নৃত্য' পরিবেশনার পর জনতা বাংলার জন্য অর্থসাহায্য করেন।^{১৩} এপ্রিলে 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' ক্ষোয়াড গঠন করে বাংলার গণনাট্য শিল্পীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে পিআরসি-র হাতে তুলে দেয়। দেশের অন্যান্য গণনাট্য শিল্পীরাও 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এঁদের অনুষ্ঠান ছিল 'জবানবন্দী'র হিন্দি অনুবাদ 'অন্তিম অভিলাষ', 'ম্যায় ভুখা হুঁ' নৃত্য, মহামারী নৃত্য, ওয়ামিক জৌনপুরির কবিতা 'ভুখা হ্যায় বঙ্গাল', শান্তি বর্ধনের ব্যালে 'সেভ বেঙ্গল', বিনয় রায়ের গান প্রভৃতি।^{১৪} 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর সাফল্য থেকেই পি সি যোশী কেন্দ্রীয় কালচারাল ক্ষোয়াডের পরিকল্পনা শুরুক করেন। কেন্দ্রীয় ক্ষোয়াড নিয়ে পি সি যোশীর পরিকল্পনা ছিল, ''উন্নতমানের শিল্পসৃষ্টির দ্বারা আমাদের বিপ্লবী বক্তব্যকে জনসাধারণের সামনে হাজির করতে পারলে, সুদূর প্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।''^{১৫}

'নবান্ন' প্রযোজনা :

১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় বিজন ভট্টাচার্যের লেখা নাটক 'নবান্ন'। পরিচালনায় শস্তু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য। মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রথম দিন অভিনয় করেন বিজন ভট্টাচার্য (প্রধান সমাদ্দার), সুধী প্রধান (কুঞ্জ), শস্তু মিত্র (দয়াল মণ্ডল), মণিকুন্তলা সেন (পঞ্চাননী), শোভা সেন (রাধিকা), গঙ্গাপদ বসু (হারু দত্ত), চারুপ্রকাশ ঘোষ (কালীধন খাড়া), তৃপ্তি ভাদুড়ী (বিনোদিনী), জলদ চট্টোপাধ্যায় (নিরঞ্জন), মণিকা ভট্টাচার্য (মাখন), সজল রায়চৌধুরী (রাজীব), ললিতা বিশ্বাস (ম্যাডোনা) প্রমুখ।^{১৬} শ্রীরঙ্গমে সাতটি শো-র পর কলকাতায় রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট, শ্রী, কালিকা থিয়েটার প্রভৃতি হলে এবং বহরমপুর, যশোর, চন্দননগর, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে 'নবান্ন'-এর প্রায় চল্লিশটি অভিনয় হয়। সুধী প্রধানের মতে প্রায় চল্লিশ হাজার দর্শক 'নবান্ন' দেখেছিল।^{১৭}

ଜ۹

'নবান্ন' বাংলা নাটকের দিকৃপরিবর্তনের সূচক। পেশাদার থিয়েটারের পৌনঃপুনিকতার চক্রব্যুহ থেকে বাংলা নাটককে উদ্ধার করার পরিকল্পনা 'জবানবন্দী'তে সূচনা হয়েছিল, 'নবান্ন'-এ এসে সার্থকতা পায়। 'নবান্ন' প্রথাগত নাট্যধারায় রচিত নয়। সমকালীন সমালোচকদের অনেকেই 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চসাফল্যকে গুরুত্ব দিয়েও নাট্যমূল্য বিচারে অকুষ্ঠ প্রশংসা করতে পারেনি। যে প্রসঙ্গে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে 'নবান্ন নাটককে ''প্রচলিত নাট্যকলা বিচারের অভ্যস্ত চশমা চোখে এঁটে বিচার করলে চলবে না।"^{১৮} 'এপিসোডিক ক্যারেকটার'^{১৯} নির্মাণের ফলে নাটকের প্রতিটি দৃশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই নাটকের নায়ক সমগ্র জনতা; তাই নাটকের চরিত্রদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য শোষিত জনতার মুখপাত্র হয়ে ওঠে। মন্বন্তরের নৃশংসতার বাস্তব-মর্মস্পর্শী কাহিনি চিত্রণের পাশাপাশি 'নবান্ন' হয়ে উঠেছিল আশাবাদের দ্যোতক। যে-কারণে 'নবান্ন' নাটকের তুলনা করা হয়েছিল 'নীলদর্পণ' নাটকের সঙ্গে। 'নীলদর্পণ'-এর তোরাপরাই দুর্ভিক্ষ নামক এক নিষ্ঠুর নিয়তির ফাঁস থেকে বেরিয়ে এসে 'জোর প্রতিরোধ'-এর ডাক দেয়। নাট্য-প্রযোজনাতেও 'নবান্ন' নতুন পথের দিশারী। তার সবচেয়ে বড়ো শক্তি ছিল সমষ্টিগত অভিনয়। শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, চিত্ত ব্যানার্জির পরিকল্পনায় চট ও বাঁশ দিয়ে সম্পূর্ণ মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। পুলিশি ঝামেলা এড়াতে গুলির শব্দ বোঝাতে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ ব্যবহার করা হয়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে শুধুমাত্র আলো-ছায়ার খেলায় পঞ্চাননীর মৃত্যুতে সমকালীন ইতিহাসকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন শম্ভু মিত্র।^{২০}

'নবান্ন' সম্ভবত গণনাট্য সংঘের নাটকগুলির মধ্যে সর্বাধিক চর্চিত। তার সাফল্য যেমন গণনাট্য সংঘের অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে, তেমনই তার সাফল্যের দায়ভারও গণনাট্য সংঘকে দীর্ঘদিন বহন করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে 'নবান্ন'-এর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব, মঞ্চ পরিকল্পনা, সাংগঠনিক ভূমিকা গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চাকে ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয়তই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সালের প্রেক্ষাপটে 'নবান্ন' আবির্ভূত হয়েছিল গণনাট্যের সার্থক উদাহরণ রূপে।

১৯৪৪-৪৫ সাল ছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘের সর্বাধিক সাফল্যের সময়। এই সময়ই চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য গণনাট্য সংঘের বিখ্যাত প্রতীক 'কল অফ দি ড্রাম' এঁকেছিলেন।^{২১} ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ক্ষোয়াডের

'ভারতের মর্মবাণী' ব্যালে, 'কল অফ দ্য ড্রাম' নৃত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন গণ মন অধিনায়ক', ইকবালের 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' সংগীত প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়। এই দলটিই ১৯৪৬ সালে অমর ভারত' বা 'Immortal India' প্রযোজনা করে। ১৯৪৬ সালের ৩০ এপ্রিল মুক্তি পায় গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত প্রথম সিনেমা 'ধরতি কে লাল' বা 'Children of Earth'। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও 'জবানবন্দী', কিষান চন্দরের ছোটোগল্প 'অন্নদাতা'-কে ভিত্তি করে খাজা আহমেদ আব্বাস চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। শ্রেষ্ঠাংশে ছিলেন শস্তু মিত্র, বলরাজ সাহনি, তৃপ্তি ভাদুড়ী, ঊষা দত্ত প্রমুখ। সংগীত পরিচালক ছিলেন রবিশঙ্কর। নৃত্য পরিচালক ছিলেন শান্তি বর্ধন। ^{২২} স্পষ্টতই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘ নিজেকে বিবিধ ক্ষেত্রে বিস্তৃত করতে পেরেছিল। বাংলার গণনাট্য শিল্পীরা তাতে অগ্রণী পথিকৃৎ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

'জবানবন্দী', 'নবান্ন'সহ গণনাট্য সংঘের সামগ্রিক সাফল্য বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। স্বয়ং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নির্দেশনায় ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চস্থ হয়।^{২৩} ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের পালটা সংগঠন রূপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১৩ এপ্রিল তাঁদের পক্ষ থেকে সুকৃতি সেনের সুরে ও পরিচালনায় 'অভ্যুদয়' গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সদস্য-সংগঠকদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বা অতুলচন্দ্র গুপ্তরা যেমন গণনাট্য সংঘের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তেমনই সুবোধ ঘোষ, সজনীকান্ত দাস প্রমুখরা ঘোষিতভাবে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন।^{২৪} ১৯৪৬ সালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আরএসপি)-র মতাদর্শে 'ক্রান্তি শিল্পী সংসদ' গঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা-ভারতবর্ষ ও রাজনৈতিক সংগ্রাম :

১৯৪৫ সালের ২ মে রাশিয়ার লালফৌজের হাতে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পতন ঘটে। আগস্ট মাসে জাপানের উপর পরমাণু বিস্ফোরণের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বাস্তবে

পুঁজিবাদী আমেরিকা ও কমিউনিস্ট রাশিয়ার মধ্যে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' শুরু হয়। বিশ্ব-রাজনীতির নতুন সমীকরণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনীতিকে আগ্নেয়গিরির কিনারায় এনে দাঁড় করায়। জাপানের পতনের পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর সেনারা ভারতে ফিরে আসতেই ব্রিটিশ সরকার তাঁদের গ্রেপ্তার করে। তাঁদের উপর প্রবল অত্যাচার করে অন্তরীণ নেতাজির সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করে ব্রিটিশ সরকার। ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর তাঁদের মধ্যে তিনজনকে দিল্লীর লালকেল্লায় প্রকাশ্য বিচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২২ নভেম্বর কলকাতায় ছাত্র-যুব, মধ্যবিত্ত, শ্রমিকদের এক বিরাট স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রা বের হয়। দু-দিনের মধ্যে মিছিল নগরী কলকাতা রীতিমতো অবরুদ্ধ নগরী হয়ে যায়।^{২৫} প্রবল জনমতের চাপে কমিউনিস্ট পার্টিও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় যে সুভাষচন্দ্রকে 'দেশদ্রোহী' বলা ভুল হয়েছিল।^{২৬}

১৯৪৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলির বিচার উপলক্ষ ফের একবার প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে মহানগরীর রাজপথ। ১১-১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৮৪ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়।^{২৭} ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের 'তলোয়ার' জাহাজে শুরু হয় রয়াল ইন্ডিয়ান নেভি-র ভারতীয় সেনা ও অফিসারদের বিদ্রোহ। পরদিন মুম্বই-এর আরও ২২টি জাহাজে ও ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলকাতা-করাচি-চেন্নাই-এর বিভিন্ন জাহাজে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সারা বিশ্বে ভ্রমণরত অবস্থায় ভারতের নৌ-সেনারা মুক্তিকামী মানুষদের লড়াই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইংরেজ সরকারের বৈষম্যগত আচরণও তাঁদের ক্ষোভের কারণ ছিল। অবশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার-প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তাঁরা বিদ্রোহ সংগঠিত করে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ৭৮টি জাহাজ, ২০টি নৌ-দফতর, ২০০০০ রেটিং বিদ্রোহে সরাসরি অংশ নেয়।^{২৮} সাধারণ মানুষের কাছে নৌবিদ্রোহের বিরোধী ছিল। ১৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনার জন্য ক্যাবিনেট মিশন আগমনের ঘোষণার ফলে কংগ্রেস বর্তমান ব্রিটিশ সরকারকে 'তত্ত্বাবধায়ক' রূপে দেখতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশকে তুষ্ট করা এবং ভবিয্যতের

নিজস্ব সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কংগ্রেস নৌবিদ্রোহকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি বল্লভভাই প্যাটেল আবেদনে রেটিং-রা আত্মসমর্পণে বাধ্য হন।^{২৯}

একাধিক সংগ্রামের পর সাধারণ মানুষের মনেও স্বাধীনতার আকাজ্জ্যা বাঁধ মানছিল না। ১৯৪৫-র জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের ভোটে লেবার পার্টি জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার ঘোষণা করেন।^{৩০} ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন শুরু হয়, যা ১৯৪৬-র মার্চ পর্যন্ত চলতে থাকে। নির্বাচনে মুসলিম লিগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না 'পাকিস্তান'-এর দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভোটতরণী পার হয়ে যান। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলিম ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তাদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। এবার শুধু বাকি রইল স্বাধীন ভারতবর্ষে কোন দল কতটা ক্ষমতা অধিকার করবে তার কৃটনৈতিক লড়াই। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬-র মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত চলল ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের দীর্ঘ আলোচনা। আগস্ট মাসে কলকাতার রাজপথের ছবি আমূল বদলে যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন, রশিদ আলি দিবস, নৌবিদ্রোহ, ডাক-তার ধর্মঘটের অসাম্প্রদায়িক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পূর্বজন্মের বিস্মৃতিতে মিলিয়ে গিয়ে ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। ক্যাবিনেট মিশনের ব্যর্থতার পর জিন্না 'মুসলিম জাতি'-কে পাকিস্তান গঠনের জন্য ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করার ডাক দেন।^{৩১} প্রথমে কলকাতায় ও পরে খুব দ্রুত মুম্বই, নোয়াখালি, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাবে দাঙ্গার নৃশংসতা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গার রেশ চলাকালীনই ২ সেপ্টেম্বর লিগ-কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে নেহরু শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশব্যাপী দাঙ্গার পরেই পরিষ্কার হয়ে যায় লিগ ও কংগ্রেসের পক্ষে মিলিত ভাবে একসঙ্গে দেশ চালানো অসম্ভব। দেশভাগ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই উদ্দেশ্যেই ১৯৪৭-এর ২৪ জুন নতুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছোলেন ৷^{৩২}

স্বাধীনতা পূর্ব গণনাট্য সংঘ—অগ্রগতি ও সংকট :

দেশব্যাপী অস্থির রাজনীতির প্রভাব থেকে বাংলায় গণনাট্য সংঘও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। সূচনালশ্নের প্রথম দু-তিন বছরের সংস্কৃতি চিন্তার মূল নীতি ছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা এবং মূল কাজ ছিল দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা। ফলে দেশীয় রাজনীতির চক্রব্যুহের বাইরে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর কংগ্রেস ও লিগ ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে কমিউনিস্টদের শক্র ভাবতে শুরু করে। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি অংশ নিলে তাকেও সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গণনাট্য সংঘ কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে দেশীয় রাজনীতির মঞ্চে নেমে পড়ে। পানু পাল লিখলেন 'পীরু মিঞার গান'। রমেশ সরকার গান বাঁধলেন 'কল্পনা দত্তে ভোট দিও ভাই'। যার ফলে গণনাট্য সংঘের কর্মী ও তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষদের উপরেও আঘাত নেমে আসে। ১৯৪৬-এর ২১ জানুয়ারি মুম্বইয়ে সিপিআই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তরে দুষ্কৃতী হামলা হয়। বছরের মাঝামাঝি সময়ে গণনাট্যের গোয়াবাগান কমিউনে হামলায় সুধী প্রধান আক্রান্ত হন। ১৯৪৭-এর শুন্ত

এতসব কিছুর মধ্যেও ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় গণনাট্য সংঘের চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে ডোভার লেনের একটি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই সম্মেলনটি পরাধীন ভারতে সংঘের শেষ সর্বভারতীয় সম্মেলন। এর পরে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির নীতির প্রভাবে গণনাট্য সংঘের গতিপথ বদলে যায়। দ্বিতীয়ত, এই সম্মেলন থেকে বাংলায় গণনাট্য সংঘকে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে পৃথক করে একটি স্বাধীন সংগঠন রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সর্বভারতীয় সভাপতি পদে পুনরায় বহাল হন এন এম যোশী। নতুন সাধারণ সম্পাদক হন খাজা আহমেদ আব্বাস। পাঁচজন সহ-সভাপতির মধ্যে বাংলার তরফ থেকে থাকেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। বাংলা থেকে কার্যকরী কমিটিতে ছিলেন হেমন্ত মুথোপাধ্যায়, সুধী প্রধান ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।^{৩৩}

এই সম্মেলনে প্রথম পরিবেশিত হয় দাঙ্গবিরোধী 'শহীদের ডাক' গীতিনাট্য। 'শহীদের ডাক'-এর গান লিখেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র; সুর করেছিলেন সলিল চৌধুরী ও দেবব্রত বিশ্বাস; চিত্রনাট্য তৈরি করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও মৃণাল সেন। সমগ্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সুধী প্রধান। গীতিনাট্যে অংশ নিতেন শম্ভু ভট্টাচার্য, ভূপতি নন্দী, খালেদ চৌধুরী, নিরঞ্জন সেন, কল্যাণী সেন, কলিম শরাফি, সজল রায়চৌধুরী প্রমুখ। 'শহীদের ডাক'-এ অসংখ্য খণ্ড দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-কৃষক পরিবারের সংগ্রাম, জোতদার-মালিকের অত্যাচার, পুলিশি সন্ত্রাস, স্বাধীনতা আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, ডাক-তার ধর্মঘট, দাঙ্গা, কংগ্রেস-লিগের আঁতাত, গণসংগ্রামের ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হত।^{৩8} 'শহীদের ডাক'-এর সাফল্য সম্পর্কে সুধী প্রধান লিখেছেন, "শহীদের ডাক' বাংলার অনেক জেলায় ঘুরেছে যা 'নবান্ন' নিয়ে আমরা পারিনি।"^{৩৫} ১৯৪৬-র সেপ্টেম্বর মাসে প্রাদেশিক কৃষকসভা থেকে তেভাগা সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। তে-ভাগার সমর্থনে সলিল চৌধুরী গান বেঁধেছিলেন, "জান কবুল আর মান কবুল/ আর দেব না আর দেব না/ রক্তেবোনা ধান মোদের প্রাণ হে"। ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলার সমস্ত প্রান্ত ঘুরে 'শহীদের ডাক' দাঙ্গা প্রতিরোধ ও কৃষক সংগ্রামের বাণী ছড়িয়ে দেয়। এছাড়াও ২৯ জুলাই ঐতিহাসিক ডাক-তার ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ময়দানের লক্ষাধিক মানুষের সভায় গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে সলিল চৌধুরী গাইলেন বিখ্যাত গান, 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে'।

তুলনায় এই সময়ে গণনাট্য সংঘের নাট্য-প্রযোজনার প্রস্তুতি ছিল নিম্প্রভ। মে মাসে অতুল গুপ্ত সংগঠিত রবীন্দ্র সমিতির আমন্ত্রণে রবীন্দ্র সপ্তাহে 'মুক্তধারা' নাটক মঞ্চস্থ করে। নির্দেশনায় ছিলেন শস্থু মিত্র। অভিনয় করেছিলেন চারুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, সত্যজীবন ভট্টাচার্য, শস্থু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সজল রায়চৌধুরী প্রমুখ।^{৩৬} এছাড়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অনুষ্ঠানে মেদিনীপুরে 'নবান্ন'-এর দুটি শো হয়। এ-ব্যতীত গোটা বছরে গণনাট্য সংঘের ড্রামা সেলের কোনো কার্যকারিতা ছিল না। বাইরের রাজনীতির চাপ যেমন ছিল, তেমনই গণনাট্যের আভ্যরন্তীণ সাংগঠনিক সংকটও এর জন্য দায়ী ছিল। 'নবান্ন'-এর উপযোগিতা, শহরের বদলে গ্রামে যাওয়ার পরিকল্পনা, শৈল্পিক স্বাধীনতার সঙ্গে রাজনৈতিক বক্তব্যের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে শিল্পী-

সংগঠক-রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্যের সূচনা হয়। বিবাদ এতটাই গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল যে ১৯৪৬ সালের ১৮ আগস্ট গণনাট্যের রাজ্য সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষকে সিপিআই নেতৃত্বদের কাছে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট জমা করতে হয়। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু সমাধানসূত্রও লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাক্রম গণনাট্য সংঘে এত জোরালো আঘাত করে যে সমাধান তো দূরের কথা, সমগ্র সংগঠনটিকেই আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।^{৩৭}

দেশভাগ-স্বাধীনতা :

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। রাত বারোটার মাহেন্দ্রক্ষণে জওহরলাল নেহরুর ভাবগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষিত হল ভারতবাসীর কাক্সিত শব্দ—স্বাধীনতা। দীর্ঘ দু'শ বছরের পরাধীনতা, অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর মৃত্যু, দুটো বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, মহামারি পেরিয়ে অবশেষে ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। কিন্তু ১৫ আগস্ট সকালে যখন নেহরু লালকেল্লায় স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করছেন, তখন পাঞ্জাব-বাংলার রক্তে ভেজা লাল মাটিতে কোটি কোটি মানুষ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন তাঁদের 'ভারতবাসী' পরিচয়ের জন্য। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর দাঙ্গার রেশ তখনও ফুরোয়নি। কোটি কোটি মানুষ সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় মাতৃভূমি ছেড়ে 'বিদেশ'-এর পথে পাড়ি দিল নতুন 'স্বদেশ'-এর সন্ধানে। তৈরি হল নতুন শব্দযুচ্ছ—উদ্বাস্ত, রিফিউজি, শরণার্থী।

দাঙ্গার সময় থেকেই পূর্ব বাংলার মুসলিম প্রধান অঞ্চল থেকে কলকাতা, ত্রিপুরায় শরণার্থী আগমন শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কিছুদিন পূর্ব-পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক বিবাদের আবহ নিস্তরঙ্গ থাকায় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলেই ধরা হয়েছিল। ১৯৪৮-এ সেপ্টেম্বরে হায়দরাবাদের নিজামের উপর ভারত সরকারের আক্রমণ, ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে পূর্ব-পাকিস্তানে বাগেরহাট দাঙ্গা, ১৯৫০-এ নেহরু-লিয়াকত চুক্তি, ১৯৫২-র আগস্টে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু প্রভৃতি ঘটনার প্রেক্ষিতে শরণার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। মহান রাজনীতিবিদদের কথায় ভরসা করে ওপার বাংলার যে-সব প্রান্তিক মানুষ নিঃস্ব অবস্থায় এ-দেশে পৌঁছেছিল, তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল শুধুই ঘৃণা আর

অবহেলা। শিয়ালদহ স্টেশনে, রিফিউজি ক্যাম্পে, কলোনিতে, বস্তিতে অমানুষের মতো আচরণ পেতে পেতে তাদের আত্মপরিচয় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে পরিকল্পনার অভাব পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে তলানিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যদিও বহু মানুষের ধারণা ছিল ভাঙা দেশ আবার জোড়া লাগবে, কাঁটা তারের বেড়া ভেঙে সব এক হয়ে যাবে।

এই আশাটুকুর নাম ছিল স্বাধীনতা। স্বাধীনতার লগ্নে কমিউনিস্ট পার্টিও উৎসবে যোগ দিয়েছিল। ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা পত্রিকার পাতায় 'সংকল্প' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে সোমনাথ লাহিড়ী যুক্তি দিয়েছিলেন,

"যাহা পাইয়াছি তাহা আমরা জানি, সেজন্যই উৎসব করিতেছি। যাহা পাই নাই, আজ আনন্দ উৎসবের মধ্যেও সে-কথা দৃঢ় চিত্তে স্মরণ করি যাহাতে আমরা উপান্তকেই সীমান্ত ভাবিয়া থামিয়া না যাই, আত্মসন্তোষের চেষ্টাহীনতা আমাদের চলার পথে বিরাম না আনে।"^{৩৮}

কিন্তু 'সকলি গরল ভেল'। স্বাধীনতা লাভের দিনই শ্রীদুর্গা কটন মিলের শ্রমিকদের ছাঁটাই করা শুরু হয়। শ্রমিকরা প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে তুললে প্রায় ৬০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।^{৩৯} বছরের শেষ দিকে বাসন্তী কটন মিল, ব্রুকবন্ড কারখানা থেকেও শ্রমিকদের ছাঁটাই করা শুরু হয়। গ্রামে তখন তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ২৭ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের 'প্রধানমন্ত্রী' (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ আইন সভায় বিশেষ ক্ষমতা আইন বা 'স্পেশাল পাওয়ার্স বিল'-এর খসড়া পেশ করেন। বিশেষ ক্ষমতা আইনের মর্মবস্তু ছিল, বিনা বিচারে জেল, সংবাদপত্রের সেঙ্গর, ধর্মঘট নিষিদ্ধ, রাজনৈতিক ধর্মঘটে পাঁচ বছরের সাজা, প্রমাণ ও বিচারহীন নিরস্কুশ দমননীতি।^{৪০} ১০ ডিসেম্বর বিলের প্রতিবাদে কলকাতায় একটি মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে রেডক্রশ কর্মী শিশির মণ্ডলের মৃত্যু ঘটে।^{৪১} অবশেষে ১৯৪৮-র ১৫ জানুয়ারি বিলটি আইনসভায় পাশ হয়। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।^{৪২}

স্বাধীনোত্তর পর্বে গণনাট্য সংঘ :

স্বাধীনতা ও দেশভাগ বাংলার গণ-সংস্কৃতি আন্দোলনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। অঞ্জন বেরার মতে,

"বিভাগ-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তান ভূখণ্ডের (পশ্চিম-পাকিস্তানেও) রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গণ-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের গণনাট্য কর্মী ও সংগঠকরা আইপিটি এ থেকে যেন আড়াআড়িভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।"⁸⁰

কমিউনিস্ট পার্টির মতো গণনাট্য সংঘও স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতামূলক অবস্থান নেয়। পার্টির নির্দেশে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট রাজ্য দপ্তরের অফিস ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে গণনাট্য সংঘ কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সঙ্গে মিলিত ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বছরের শেষ লগ্নে ২৬-৩১ ডিসেম্বর গুজরাটের আহমেদাবাদে গণনাট্য সংঘের পঞ্চম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন নিরঞ্জন সেন। পশ্চিমবঙ্গের স্কোয়াড 'শহীদের ডাক' গীতিনাট্যের হিন্দি অনুবাদ পরিবেশন করে। সম্মেলনে 'সুখী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়িবার' জন্য গণনাট্য ভারতের অন্যান্য শিল্প সংগঠনগুলিকে আহ্বান জানায়।⁸⁸

ডিসেম্বর মাসে গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে প্রযোজিত হয় দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বাস্তুভিটা'। ১৯৪৮-র গুরুতে সজল রায়চৌধুরীর লেখা 'পনেরোই আগস্টের পর' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। 'নবান্ন'-এর পর দীর্ঘ তিন বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটল নাটকদুটি অভিনয়ের মাধ্যমে। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে চারুপ্রকাশ ঘোষ ও সুধী প্রধানের অনুরোধে গণনাট্য সংঘে যোগ দেন।^{৪৫} নাটককারের 'বাস্তুভিটা' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৮ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দীপায়ন ক্লাব নামক একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা দ্বারা।^{৪৬} নাটকটি ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে লিগ সরকার নিষিদ্ধ করে রেখেছিল।^{৪৭} গণনাট্য সংঘের প্রযোজনাটির নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। গণনাট্য সংঘ ছাড়ার আগে পর্যন্ত তিনি

'মহেন্দ্র মাস্টার'-এর চরিত্রে অভিনয় করতেন। সজল রায়চৌধুরীর লেখা নাটকটি সলিল চৌধুরীর নির্দেশনায় মালঞ্চ মাহীনগরে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল।

এর কিছুদিন পরে কমিউনিস্ট পার্টির 'রণদিভে লাইন'-এর প্রয়োগ ও এলাহাবাদে গণনাট্যের ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলন বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় পর্ব :

সিপিআই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেস ও 'মিথ্যা স্বাধীনতা'র রাজনীতি :

১৯৪৮-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে। পি সি যোশীর পরিবর্তে সাধারণ সম্পাদক হন বি টি রণদিভে। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের সঙ্গে বদলানো হল পার্টি লাইন। বলা হল এই স্বাধীনতা 'ঝুটা স্বাধীনতা'। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে শুধুমাত্র পুঁজিপতি ও জমিদারদের প্রহরী হওয়ার জন্য শাসনক্ষমতার মালিকানা বদল হয়েছে।^{৪৮} যোশীবাদী নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলা হল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এতদিন পেটি বুর্জোয়া মতধারায় চলছিল এবং সেই কারণেই শ্রমিকশ্রেণিকে প্রকৃত মার্কসবাদের ধারায় ক্ষমতা দখলের জন্য ডাক দেয়নি।^{৪৯} বর্তমান রাজনৈতিক লাইনে ক্ষমতা দখলের বিপ্লবে শ্রমিকরাই থাকবেন মূল নেতৃত্বে। আর কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে

প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির একটি রিপোর্টে আক্ষরিক অর্থেই 'গৃহযুদ্ধ'-এর ডাক দেওয়া হয়।

"এমন পরিস্থিতি এসে যায় যখন শ্রেণিসংগ্রাম খুব উঁচু পর্দায় ওঠে যখন শাসকশ্রেণিই শান্তিপূর্ণ লড়াই-এর সব পথ বন্ধ করে দেয়, যখন জনগণকে বাধ্য হয়েই গৃহযুদ্ধ (সিভিল ওয়ার) চালাতে হয়। এ সকল পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ অহিংসার অচলায়তন আবদ্ধ থাকার অর্থই হল জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।"^{৫০}

১৯৪৯-এর ১ অক্টোবর মাও-জে দং চীনা জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। চিনের বিপ্লব সিপিআই-কে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ডিসেম্বরের একটি রিপোর্টে ঘোষণা করা হয় যে 'চিনের মতো ক্ষমতা দখল' করতে হবে।^{৫১} এই বছরের বিভিন্ন রিপোর্টে 'কংগ্রেসিদের পিটাও', 'তাদের বাড়িতে আগুন লাগাও', 'মন্ত্রীদের হত্যা কর'-র মতো বিপজ্জনক স্লোগান দেওয়া হয়েছিল।^{৫২}

তেভাগা আন্দোলনও এই সময়ে সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ নেয়। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে ১৯৪৬ সালে কৃষক সভা থেকে 'তেভাগা'-র ডাক দেওয়া হয়েছিল। 'আধি নয়—তেভাগা'-র ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৪৭-এর জানুয়ারির মধ্যে অবিভক্ত বাংলার ১৩টি জেলার কৃষক নিজের খামারে ধান তুলে ফেলে।^{৫৩} উত্তরবঙ্গের তেভাগা ও টঙ্ক আন্দোলনকে প্রথমে ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও পরে স্বাধীন ভারতের পুলিশ প্রবল অত্যাচার করে বন্ধ করে দেয়। একই সময়ে হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানাতেও কৃষক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। নিজাম-জমিদার-দেশমুখদের আক্রমণকে প্রতিহত করে আড়াই হাজার গ্রামের ৫০ লক্ষ কৃষক ভারতের 'প্রথম শাসনতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেছিল। হায়দরাবাদকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার সময় ভারতীয় সেনা তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামকে ধ্বংস করে দেয়। নিহত হন প্রায় ২০০০ কৃষক, গ্রেপ্তার ৫০ হাজারেরও বেশি, ধর্ষিত কয়েকশো রমণী।^{৫৪} সেই আদর্শে বাংলার কৃষকদের প্রবল সংগ্রামে কাকদ্বীপ-সোনারপুর-লালগঞ্জ-চন্দনর্পিড়ি 'মুক্তাঞ্চল'-এ পরিণত করেছিল। ১৯৫০ সাল নাগাদ স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের কাছে তাদেরও হার মেনে নিতে হয়। কিন্তু কৃষক রমণী গর্ভবতী অহল্যা বা সরোজিনী-বাতাসী-উন্তমীর রক্তের দাগ বাংলার মাটি থেকে কোনোদিন শুকিয়ে যায়নি।

তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি আগাগোড়া যুক্ত ছিল। কিন্তু 'ঝুটা স্বাধীনতা'র ডাক ও বেআইনি হওয়ার পর পার্টির সঙ্গে কৃষক নেতাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। পার্টি কংগ্রেসের কুড়ি দিনের মাথায় ২৬ মার্চ ফৌজদারি আইনের ১৬ নম্বর ধারা অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গে বেআইনি ঘোষণা করা হয়।^{৫৫} ১৯৪৯-এ রেলওয়ে মেন্স্ ফেডারেশন জেনারেল কাউন্সিলের ৯ মার্চ সারা ভারতে রেল ধর্মঘটের ডাক ব্যর্থ হয়। ২৭ এপ্রিল কলকাতায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির চার নেত্রী লতিকা-অমিয়া-গীতা-প্রতিভাসহ মোট দশজন পুলিশের

গুলিতে মারা যান।^{৫৬} শ্রমিক আন্দোলন-ধর্মঘট-গুলি চালনা-লাঠি চার্জ তখন কলকাতা ও শহরতলি অঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিও কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। চরমপন্থী নীতির কারণে জনতার মধ্যে থেকেও কমিউনিস্ট পার্টির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত কোনো প্রতিবাদ দানা বাঁধেনি। আবার বর্তমান নীতি-বিরোধী যে-কোনো মতামতকেই 'পেটি বুর্জোয়াপন্থী', 'সংক্ষারবাদী' বলে দাগিয়ে দেওয়ার একটা সংকীর্ণ প্রথা চালু হয়। সব মিলিয়ে এই সময়ে পার্টির মধ্যে চরম অবিশ্বাস ও অরাজকতার সূচনা হয়।

'ঝুটা স্বাধীনতা'র রাজনীতি ও গণনাট্য সংঘ :

সিপিআই-এর নতুন নীতি থেকে গণনাট্য সংঘ ও গণসংস্কৃতি আন্দোলনও মুক্ত ছিল না। পার্টির তাত্ত্বিক অবস্থানে অস্পষ্টতা, তৃণমূল স্তরের পরিস্থিতি বিচার না করে উপর থেকে নির্দেশ চাপিয়ে দেওয়া গণ-সংস্কৃতি কর্মীদের কাছে বিরূপ বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। হুগলি জেলার গণনাট্য কর্মী গুরুদাস পাল খুব সহজ করে বলছেন,

"মোদ্দা কথা যে টুকুন বুঝেছিলাম, তা হচ্ছে এই যে, এখনই আমাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে হবে। এবং সেটা হবে নিছক গায়ের জোরে, ডাণ্ডার জোরে, লাঠিবাজির মধ্য দিয়ে। এই চিন্তার ছাপ স্বাভাবিকভাবেই আমার নাটকের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল।"^{৫৭}

পার্টির দলিলগুলিতে 'গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণি'র ভূমিকা নিয়ে কোনো নির্দেশ ছিল না। 'ট্রটস্কীয় নীতি'র ছায়ায় বুদ্ধিজীবীদের সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হয়েছিল।^{৫৮} ফলে গণশিল্পীদের মধ্যে নিজেদের 'বিপ্লবী' প্রমাণের এক ইঁদুর-দৌঁড় শুরু হয়। 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় ভবানী সেন রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া' ঘোষণা করেন। 'লোকনাট্য' পত্রিকায় সজল রায়চৌধুরী ও সুরপতি নন্দী গণনাট্যের এযাবৎকালীন শিল্পচর্চাকে মধ্যবিত্তের আন্দোলন ঘোষণা করেন। চিন্মোহন সেহানবীশ শিল্প সৃষ্টির আগে সকলকে ফ্রন্টে যাওয়ার নিদান দিলেন।^{৫৯}

এই সময়েই শৈল্পিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের বিতর্কে শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, মহম্মদ ইসরাইল প্রমুখ গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে যান। শস্তু মিত্র ১৯৪৮ সালে 'বহুরূপী' নাট্যদল গড়ে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ঢোলবাদক দশরথলাল পাড়ি দিলেন মুম্বই-এ। প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি ও গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অনিল ডি'সিলভা ফ্রান্সে চলে যান। বিনয় রায় চলে যান মস্কো। গণনাট্যের কেন্দ্রীয় স্কোয়াড ভেঙে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ১৯৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ সিপিআই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হওয়ার আগের দিন ২৫ নম্বর ডিকসন লেনে গণনাট্য কর্মী চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যুব-ছাত্র সম্মেলন' উপলক্ষ্যে বিদেশি প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনায় একদল মুখ-ঢাকা আততায়ী ঢুকে স্টেনগান থেকে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় 'শহীদের ডাক' গীতিনাট্যে শহীদ রামেশ্বরের চরিত্রাভিনেতা সশীল মুখার্জির। পরদিন মারা যান চারুপ্রকাশ ঘোষের ভাতুষ্পুত্র ভবমাধব ঘোষ। ৬০ পার্টি বে-আইনি হওয়ার পর গ্রেপ্তার হন গোপাল হালদার, হীরেন মুখার্জি, সভাষ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, রেবা রায়চৌধুরী। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের গণনাট্য শিল্পীরা গ্রেপ্তার হওয়ায় বা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় গণনাট্যের শাখাগুলি ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালের ১৯ জুন বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার ১৮৭৬ সালের কুখ্যাত নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সার্কুলার জারি করে গণনাট্য সংঘের নাটক বাজেয়াপ্ত ও নাট্যাভিনয় বন্ধ করার নির্দেশ দেন ৷^{৬১}

গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলন :

১৯৪৯-এর ৪-৯ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদে গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন মহারাষ্ট্রের মজদুর কবি আন্নাভাই শাঠে। সহ-সভাপতি পদে বাংলা থেকে ছিলেন নরহরি কবিরাজ। সাধারণ সম্পাদক হন নিরঞ্জন সেন।

ডিকসন লেন হত্যাকাণ্ডে মৃত সুশীল মুখার্জি ও ভবমাধব ঘোষের স্মৃতিতে শপথ নিয়ে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। মূল প্রস্তাবে বলা হয় বর্তমানে পৃথিবীর শিল্পসাহিত্য দুই শিবিরে

বিভক্ত। এই পরিস্থিতিতে গণনাট্য সংঘ শ্রমিক, কৃষক, সংগ্রামী মধ্যবিত্তসহ শোষিত মানুষের জন্য শিল্প সৃষ্টি করবে। সরকারের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী শ্রেণি গড়ে তুলে গণনাট্য সংঘকে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার রূপে গড়ে তুলতে হবে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে এই সম্মেলনেই গণনাট্যকে সত্যিকার মজুর ও কৃষক শিল্পীদের নেতৃত্বে গড়ে তোলার প্রথম সচেতন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।^{৬২} সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। মহারাষ্ট্রের গণসংগীত শিল্পী অমর শেখ গান গেয়েছিলেন, 'হাম ক্যা জানে, কি ভারতমে আয়া হ্যায় স্বরাজ/ আজভি হাম ভুখা নাঙ্গা হ্যায়'।^{৬৩} এলাহাবাদের 'প্যান্টোমাইম', দিল্পীর 'বিভক্ত পাঞ্জাব' নৃত্যনাট্যও জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে মুম্বইয়ের তরফ থেকে বলরাজ সাহনির লেখা 'জাদু কি কুর্সি' ও বাংলার পক্ষ থেকে অনিল ঘোষের লেখা 'নয়ানপুর' নাটক ছিল সম্মেলনের মূল আকর্ষণ। অন্ধের গণনাট্য শিল্পীরা জেলবন্দী থাকায় অনুপস্থিত ছিলেন।^{৬৪}

ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলনের আগেই কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগণার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। যার সম্পাদক করা হয় সজল রায়চৌধুরীকে।^{৬৫} রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিকূলতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে গণনাট্য সংঘের কাজকর্ম বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। ১৯৫৫ সালের একটি রিপোর্টে ওই সময়ের মূল্যায়নে জানানো হয়েছিল যে ১৯৪৯ সালে কলকাতার দুটি শাখা ছাড়া প্রাদেশিকভাবে গণনাট্যের কোনো অন্তিত্ব ছিল না।^{৬৬} অবশ্য এই সময়েই ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, শোভা সেন, কালী ব্যানার্জি, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো একদল তরুণ শিল্পী গণনাট্য সংঘে নতুন রক্তের সঞ্চার করেছিলেন।

উদ্ভ্রান্ত সময়ে সংগঠন পরিচালনার থেকে কঠিন বিষয় ছিল রিহার্সালের বন্দোবস্ত করা। সজল রায়চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন কীভাবে একটি 'মাসাজ ক্লিনিক'কে ক্যামোফ্লেজ করে রিহার্সাল করা হত।^{৬৭} কিন্তু সে-সব সত্ত্বেও এই সময়কালে গণনাট্য সংঘ অসামান্য কিছু শিল্পসৃষ্টি করেছিল। তেভাগা আন্দোলন ও গর্ভবতী অহল্যা মায়ের মৃত্যুতে ক্রোধ, ঘৃণা, যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছিল গণনাট্যের গানে, কবিতায়, নাটকে। সেই নৃশংসতার প্রতিবাদ ধ্বনিত হল সলিল চৌধুরীর 'শপথ' কবিতায়— "সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে/ হরতাল হয়েছিল"। বিনয় রায় লিখেছিলেন, "অহল্যা মা তোমার সন্তান জন্ম নিল না"। প্রতিবাদী মানুষের মুখে মুখে ফিরত সলিল চৌধুরীর গান "আমার

প্রতিবাদের ভাষা, আমার প্রতিরোধের আগুন"। জনপ্রিয় হয়ে ওঠে গুরুদাস পালের "ওরে সাথীরে— /শুনছো কি কলকাতার খবর", অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'শুকসারী সংবাদ', সলিল চৌধুরীর 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা' প্রভৃতি গান। ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতা'-কে ব্যঙ্গ করে হেমাঙ্গ বিশ্বাস লেখেন 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য'।

গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সম্মেলন থেকেই গণনাট্য সংঘকে পৃথক সংগঠন রূপে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। নাট্য-প্রযোজনাতেও ব্যাপক তাত্ত্বিক পরিবর্তন আসে। বলা হয়, গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চা স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের মতো আঙ্গিক নির্ভর শহুরে নাট্যচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে কৃষক-মজুরের মধ্যে গিয়ে সংগ্রামী বার্তা প্রচার করবে। "ধানের ক্ষেতে ফুল ফোটালে চলবে না। ধান বুনতে হবে।"^{৬৮}

অনিল ঘোষের 'নয়ানপুর' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৪৮ সালে বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটিতে। দ্বিতীয় অভিনয় হয় ডোঙাজোড়া গ্রামেই। সেদিনের প্রযোজনায় অভিনয় করেছিলেন অনিল ঘোষ, রঘু চক্রবর্তী, দীপালী গাঙ্গুলি, সুনীল ভট্টাচার্য প্রমুখ।^{৬৯} গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সম্মেলনেও নাটকটি অভিনীত হয়। তেভাগা আন্দোলনের কালে নয়ানপুরের ডোঙাজোড়া গ্রামের কৃষক সংগ্রামের ঘটনা নিয়ে গণনাট্য সংঘের চব্বিশ পরগণা শাখার সম্পাদক অনিল ঘোষ 'নয়ানপুরে' নাটকটি লেখেন। নাটকটির কোনো পাণ্ডুলিপি আজ আর পাওয়া যায় না।

১৯৪৮ সালের গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা ছিল সলিল চৌধুরীর লেখা 'জনান্তিক'। অভিনয়ে ছিলেন কালী ব্যানার্জি, মমতাজ আমেদ খাঁ, সুধীর চৌধুরী, সজল রায়চৌধুরী, ইন্দিরা কবিরাজ প্রমুখ। এ-বছরের আরেকটি প্রযোজনা মণীন্দ্র মজুমদারের 'মৃত্যু নাই' নাটক। ১৯৪৯ সালে অভিনীত হয় সলিল চৌধুরীর লেখা নাটক 'সংকেত'। পুলিশের নজর এড়াতে নাটকটি 'প্রতিধ্বনি' নামেও অভিনীত হত।^{৭০} দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'তরঙ্গ' নাটকটি ১৯৪৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি গণনাট্যের উত্তর কলকাতা শাখা মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনয় করে। যদিও দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঝুটা স্বাধীনতা'র তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। অরুণ চৌধুরীর লেখা 'সব পেয়েছির দেশ' নাটকটি ১৯৪৯

সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মনোহরপুকুর রোডে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সজল রায়চৌধুরীর মতে এ-বছরে প্রযোজিত 'ডাক' নাটকটি জেলখানা থেকে এসেছিল।^{৭১} কিন্তু অনিল ঘোষের মতে অসিত ঘোষালের লেখা 'সাড়া' নাটকটিই 'ডাক' নামে অভিনীত হত।^{৭২} এ-বছরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পূর্ণগ্রাস'।

তৃতীয় পর্ব :

আন্তঃপার্টি সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টির লাইন পরিবর্তন :

১৯৪৯-র শেষ থেকেই রণদিভের সংকীর্ণতাবাদী লাইন ও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের^{৭৩} বিরুদ্ধে পার্টির মধ্যে আত্মসমালোচনা শুরু হয়েছিল। ১৯৫০-এর ২৭ জানুয়ারি রাশিয়ার কমিনফর্মের মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পিস অ্যান্ড ফর পিপলস ডেমোক্র্যাসি'-র সম্পাদকীয়তে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। দলিলে বলা হয়,

"ভারতবর্ষ এমন স্তরে আছে যখনকার কর্মসূচি সশস্ত্র সংগ্রাম নয়। স্বরূপ উদ্ঘাটন অভিযানের উপরই আমাদের জোর দিতে হবে।"⁹⁸

দলিলটিতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর যুক্তফ্রন্ট গঠনের উল্লেখ করা হয়। যে ফ্রন্টে শ্রমিক, ছোটো ও জমিদার নয় এমন কৃষক, জাতীয় বুর্জোয়া, সকল ধরণের মধ্যবিত্তকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে 'মেকি' প্রমাণ করে বর্তমানে বিপ্লবের স্তর ও রণকৌশল ঠিক করে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই দলিলটি নিয়ে এতদিন পার্টির নির্দেশ মেনে চলা সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মীদের মধ্যে সংশয় দেখা দেয়। মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন,

"কী কাণ্ড! আমরা তো তখন শ্রেণিসংগ্রাম করছিলাম। সঙ্গী ছিল শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, চাষি ও ক্ষেতমজুর। বাকি সবাই শত্রুপক্ষ। কিন্তু ঐ পত্রিকায় বর্ণিত গোষ্ঠী নিয়েই যদি আবার

মিত্রতা গড়তে হয় তবে এতদিন করছিলামটা কী? 'এ আজাদি ঝুটা হ্যা' বলে জেলেই বা এলাম কেন? আর উপোস করেই বা মরছি কেন?"^{৭৫}

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি থেকে প্রকাশিত 'সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা' দলিলে পার্টির প্রতিটি পদক্ষেপকে পুজ্থানুপুজ্থভাবে সমালোচনা করা হয়। এই দলিলে পার্টির শহুরে অভ্যুত্থানের নীতিকে 'অর্থহীন', গ্রামের লড়াইয়ে পার্টি নেতৃত্বের ভূমিকাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' এবং পার্টি নেতৃত্বকে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোর মতো স্বৈরাচারী বলা হয়।^{৭৬} আন্তঃপার্টি সংগ্রামের মাধ্যমে তাত্ত্বিক নীতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া গুরু হয়। সেপ্টেম্বরে প্রবোধচন্দ্র (অজয় ঘোষ), প্রভাকর (ডাঙ্গে), পুরুষোত্তম (ঘাটে) ছদ্মনামে লেখা 'থ্রি পি'স লেটার'-এ পার্টির সর্বভারতীয় কাঠামো বদলে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরে ১৩ জনকে নিয়ে একটি যুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি হয়।

এদিকে ১৯৫১-র ৫ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি আইনত স্বীকৃতি লাভ করে। অক্টোবর মাসে পার্টির রাজ্য সম্মেলন থেকে মুজফ্ফর আহমদ্কে রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত সারা ভারত পার্টি সম্মেলন থেকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন অজয় ঘোষ।^{৭৭}

১৯৫১-৫২ সালে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দু'শ বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্ত দেশে তখনও অসংখ্য সমস্যা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্ত পরিস্থিতি, বেহাল কৃষি-অর্থনীতি, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা, বেকার সমস্যায় জর্জরিত শিশুরাষ্ট্রকে নিয়ে ক্রমেই দুশ্চিন্তার কালোমেঘ জড়ো হচ্ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের কাছে এই নির্বাচন ছিল মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে নিরস্কুশ ক্ষমতা দখল করা। অন্যদিকে সদ্য নির্বাসন-মুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের তাগিদ ছিল। সিপিআই মনে করেছিল, "সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণি এবং কমিউনিস্ট পার্টি কিছুতেই উদাসীন থাকতে পারে না।"^{৭৮} সোমনাথ হোড়ের আঁকা 'কান্তে-ধানের শিষ' হল সিপিআই-এর নির্বাচনী প্রতীক।^{৭৯} নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেসি সরকারকে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সরকার,

জমিদারের সরকার, সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে প্রকৃত জন-গণতান্ত্রিক সরকারের ঘোষণা করা হল।^{৮০} নির্বাচনে কংগ্রেস ব্যাপকভাবে জয়যুক্ত হয় এবং বামপন্থী দলগুলি পর্যদুস্থ হয়। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন জওহরলাল নেহরু।

গণনাট্য সংঘে আত্মসমালোচনা ও পুনর্গঠন :

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে সদ্য আইনি হওয়া কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য সংগঠকদের সামনে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ ছিল। গণনাট্য সংঘের অন্দরে শুরু হয় আত্মসমালোচনা। সাংস্কৃতিক কর্মীদের ফ্রন্টে যাওয়া, 'অতিবাম' সংগ্রামী সংস্কৃতি গড়ে তোলার নির্দেশ, অতীত ঐতিহ্যকে 'বুর্জোয়া' বলে প্রত্যাখ্যান, পার্টি নীতি নিয়ে প্রশ্নকারীকে 'ট্রটস্কীপন্থী' বলে চিহ্নিত করার নীতি থেকে সচেতনভাবে বেরিয়ে আসার চেষ্টা শুরু হয়। পার্টির সঙ্গে গণসংস্কৃতি আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার জন্য পার্টির তরফ থেকে একটি সাংস্কৃতি কমিটি তৈরি করা হয়। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘকে পার্টির মতবাদ প্রচার ও গণসংস্কৃতি আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আরও কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়।^{৮১} রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ডের গণনাট্য কর্মী ও সংগঠকরা জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর সংগঠনকে পুনর্গঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সুনীল দন্ত লিখছেন যে ওই সময়ে বঙ্গীয় কলালয়ে আটদিন ধরে চলা একটি মিটিং থেকে সংঘকে 'ডি-সেন্ট্রালাইজড' করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।^{৮২}

১৯৫১ সালের ১৪ মে মুম্বইয়ে ১৪টি প্রদেশের গণনাট্য সংঘের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা বসে। যেখানে ১৯৪৯ সালের ষষ্ঠ সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলনের নীতিকে বাতিল করা হয়। সম্পাদকের দায়িত্বে পুনর্বহাল থাকেন নিরঞ্জন সেন। সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের মুখপত্র 'ইউনিটি' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও তিনিই গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের পর পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে গণনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ডে গতি আসে। ঋত্বিক ঘটকের 'অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট' গ্রন্থের মুখবন্ধে সুরমা ঘটক জানাচ্ছেন যে ১৯৫১ সালে ঋত্বিক ঘটকেরে রাজ্যে গণনাট্য সংঘের রাজনৈতিক

ও সাংস্কৃতিক আদর্শ কী হবে তার উপর একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দলিলটির খসড়া ১৯৫১ সালের ১ জুন সুরপতি নন্দী প্রকাশ করেন।^{৮৩} যদিও সেটি গ্রহণ করা হয়নি।

১৯৫১ সালে গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নতুন নাটকের প্রযোজনা করা হয়। আসন্ন ভোটের প্রচারেও মেতে উঠলেন গণনাট্যের শিল্পীরা। রমেশ শীলের 'ভোটের গান', পরেশ ধরের 'ভোট রংগ' ও 'শান্তি তরজা' ছিল মুখ্য হাতিয়ার। কলকাতা শাখার নৃত্য বিভাগের তরফ থেকে তেভাগা আন্দোলন নিয়ে সৃষ্টি হল কালজয়ী 'অহল্যা' নৃত্যনাট্য। কাহিনি ও সংলাপ লিখেছিলেন ননী ভৌমিক। গান রচনা করেছিলেন সলিল চৌধুরী, বিনয় রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুরপতি নন্দী। অভিনয়ে ও নৃত্যে ছিলেন খুকু গুপ্ত, শম্ভু ভট্টাচার্য, ডলি ঘটক, শক্তি নাগ, নির্মল ঘোষ প্রমুখ।^{৮৪} তেভাগা আন্দোলনের সময় গর্ভবতী অহল্যাকে পুলিশ গুলি করে মেরেছিল। তাঁর সন্তান জন্ম নেয়নি, কিন্তু গণনাট্যের অসংখ্য সৃষ্টিতে তাঁর গর্ভযন্ত্রণা পৃথিবীর আলো পেয়েছিল।

এ-বছর সাফল্যের সঙ্গে প্রযোজিত হয় নির্মল ঘোষের 'আরতি', জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের 'নাটক নয়' প্রভৃতি নাটক। বজবজের শ্রমিকদের দ্বারা রচিত ও অভিনীত হয় 'দাবি' নাটকটি। বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'ঢেউ' নাটকটি ছিল কৃষি সমস্যাভিত্তিক। একই সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছিল অনিল ঘোষের 'উদয় অস্ত' ও সলিল চৌধুরীর 'এই মাটিতে' নাটক। সলিল চৌধুরীর 'জনান্তিক', 'সংকেত', 'এই মাটিতে' তিনটি নাটকেরই কোনো কপি পাওয়া যায় না।^{৮৫} সলিল চৌধুরীর আরেকটি নাটক 'অরুণোদয়ের পথে' এ-বছরই অভিনীত হয়। নাটকটি লেডি গ্রেগরির 'দ্য রাইসিং অফ দ্য মুন' অবলম্বনে রচিত।

এই সময় পূর্ণেন্দু পাল বা পানু পালের হাত ধরে বাংলায় পথনাটিকা ও পোস্টার-নাটিকা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। উৎপল দত্তের মতে, 'Panu Pal, the creator of street-corner plays'।^{৮৬} পানু পালের লেখা 'ভাঙা বন্দর' নাটকটিতে তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার ভাঙা-গড়ার খেলাকে এক মৎস্যজীবী পরিবারের আখ্যানে তুলে ধরা হয়েছিল। এই নাটকের সূত্রেই উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। ছিলেন মাত্র দশ মাস। তাঁর নির্দেশনায় একটি ঘরোয়া

সমাবেশে প্রথম প্রযোজিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটক। অভিনয় করতেন ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, কালী ব্যানার্জি, প্রীতি ব্যানার্জি প্রমুখ।^{৮৭} সলিল চৌধুরীর 'গুণময় গুঁই' গল্প অবলম্বনে উমানাথ ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, পানু পাল মিলে 'চার্জশিট' নাটকটি তৈরি করেন। বন্দীমুক্তির প্রেক্ষিতে লেখা এই নাটকটিকে সুনীল দত্ত 'প্রথম পোস্টার নাটিকা' বলেছেন।^{৮৮}

নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্চস্থ প্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের 'একদা ১৯৫২', পানু পালের 'ভোটের ভেট' প্রভৃতি নাটক বেশ জনপ্রিয় হয়। 'ভোটের ভেট' সম্পর্কে উমানাথ ভট্টাচার্য লিখছেন, "দু-মাসে মনে পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটা শো করেছি"।^{৮৯} মণীন্দ্র মজুমদারের লেখা 'নাগপাশ' নাটকটি উত্তর কলকাতা শাখা টিপু দাশগুপ্তের পরিচালনায় প্রথম মঞ্চস্থ করে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রমানাথ সেনগুপ্ত, শান্তি মুখার্জি, তরুণ চন্দ্র, কানু মণ্ডল, অমিয় সেনগুপ্ত, শঙ্করী বিশ্বাস প্রমুখ।^{৯০} ১৯৫১-র ডিসেম্বরে ঋত্বিক ঘটক নিকোলাই গোগলের লেখা 'গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর' নাটকটির প্রমথনাথ বিশীকৃত অনুবাদটি পরিমার্জনা করে 'অফিসার' নাম দিয়ে মঞ্চস্থ করেন। ১৯৫২-র নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারি আমলাতন্ত্রের মুখোশ খোলার উদ্দেশ্যে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সুরমা ঘটকের মতে একমাসে প্রায় ৫২টি শো হয়েছিল 'অফিসার'-এর।^{৯১}

গণনাট্য সংঘের নৈহাটি কনভেনশন ও ১৯৫২-র নাট্য প্রযোজনা :

১৯৫২ সালের ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কনভেনশন হয়। এই কনভেনশন ছিল রাজ্যে সংগঠন পুনর্গঠিত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ। কনভেনশন উদ্বোধন করেছিলেন ডঃ জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন শচীন সেনগুপ্ত, নিরঞ্জন সেন প্রমুখ। খসড়া কমিটির প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর নির্মল ঘোষ, সজল রায়চৌধুরী ও রঘু চক্রবর্তী নতুন খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। কনভেনশন থেকে তৈরি হওয়া রাজ্য কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন শচীন সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক নির্মল ঘোষ।^{৯২} কনভেনশনে গণনাট্য সংঘের ইতিহাসে প্রথমবার

একটি 'সাংগঠনিক নিয়মাবলি' গ্রহণ করা হয়। এই দলিলটিতে সভ্যপদ গ্রহণের প্রক্রিয়া, অধিকার, জেলা কমিটি, প্রাদেশিক কমিটির কর্তব্য বিবৃত করা ছিল।^{৯৩}

নৈহাটি কনভেনশনে সুভাষ বসু রচিত 'চিতা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা অবলম্বনে গোবিন্দ চক্রবর্তীর নাট্যরূপ 'আবাদ' এবং ওঁনারই রচনা ও পরিচালনায় 'জনক' নাটকটিও এ-বছর মঞ্চস্থ হয়। তবে নিঃসন্দেহে এ-বছরের শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনা ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল'। উদ্বাস্ত পরিস্থিতি নিয়ে লেখা নাটকটি জুলাই মাসে ২০৬, লোয়ার সার্কুলার রোডে ভূপতি নন্দীর বাড়ির ছাদে প্রথম অভিনীত হয়। 'ডি-সেন্ট্রালাইজড' গণনাট্য সংঘের 'সেন্ট্রাল স্কোয়াড', ঋত্বিক ঘটক যার নাম দিয়েছিলেন 'অনুশীলন শাখা', তারাই ছিল নাটকটির প্রযোজনায়। 'দলিল' নাটকে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক, মমতাজ আহমেদ খাঁ, শোভা সেন, মমতা চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আলোকসম্পাতে ছিলেন তাপস সেন।^{৯৪}

গণনাট্য সংঘের সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলন :

১৯৫১-তে মুম্বইতে একটি বৈঠকে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘকে পুনর্গঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। প্রায় দু-বছরের প্রস্তুতির পর অবশেষে ১৯৫৩ সালের ৬-১২ এপ্রিল মুম্বইতে গণনাট্য সংঘের সঞ্চম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯-এর বিতর্কিত ষষ্ঠ সম্মেলনের পর গণনাট্য সংঘকে দীর্ঘ চার বছর অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছিল। দেশের পরিস্থিতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ফলে সপ্তম সম্মেলনে গৃহীত আদর্শ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে গোটা দেশের গণনাট্য শিল্পীরা তাকিয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় পাঁচশোরও বেশি প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নেন। যার মধ্যে প্রতিনিধি ও দর্শক মিলিয়ে বাংলা থেকে ছিলেন ১২৫ জন।^{৯৫}

সম্মেলনের সিদ্ধান্তে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভাপতি হন চলচ্চিত্র পরিচালক বিমল রায়। সম্পাদক পদে পুনর্নিবার্চিত হন নিরঞ্জন সেন। যুগ্ম সম্পাদক হন নির্মল ঘোষ ও যশবন্ত ঠক্কর।

কার্যকরী সমিতিতে বাংলা থেকে নির্বাচিত হন সলিল চৌধুরী, সজল রায়চৌধুরী, গোবিন্দ চক্রবর্তী ৷^{৯৬} সম্মেলনের শেষ দিনে 'দলিল' নাটকটির অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। 'দলিল' নাটক ও শীলা ভাটিয়ার 'কল অফ দ্য ভ্যালি' নৃত্যনাট্য শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানের পুরস্কার পায়। এছাড়া পেশাদার-অপেশাদার মঞ্চের উপর প্রমোদ কর রদ, প্রি-সেন্সরশিপের অবসান, সরকারি কর্মচারিদের গণনাট্যে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, নাট্যশিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সদর্থক পদক্ষেপ দাবি করা হয়।^{৯৭} প্রস্তাবে 'সংগীত-নাটক আকাদেমি'-কে স্বাগত জানিয়ে প্রগতিশীল নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির একজন করে প্রতিনিধি গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয়। এই সম্মেলনেই কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ বলেছিলেন যে প্রগতি কথাটা অস্পষ্ট, তাই যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল নয়, গণনাট্য সংঘ তাই করবে।^{৯৮}

১৯৫৩ সালে পুরনো নাটকগুলি ছাড়াও জুলিয়াস ফুচিকের জীবনী অবলম্বনে 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে', ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোলটেবিল' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ভানু চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'আজকাল' নাটকটি উত্তর কলকাতা শাখা দ্বারা ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ সালে প্রথম অভিনীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলায় খাদ্যসংকট, কালোবাজারি, মধ্যবিত্তের জীবন-সংগ্রাম নিয়ে নাটকটি রচিত। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোলটেবিল' নাটকে সংবাদপত্র জগতের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও আদর্শহীনতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। নাটকটি লেখার 'অপরাধে' আনন্দবাজার পত্রিকা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কর্মচ্যুত করে।

গণনাট্য সংঘের সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে অজয় ঘোষ 'প্রগতি'র যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই বিতর্কের রেশ থেকে আরও অনেক প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল। গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কাঠামো নিয়ে অযাচিতভাবেই বিতর্কেরও সূচনা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে কেরালার কমিউনিস্ট নেতা ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ প্রশ্ন তুলেছিলেন গণনাট্য সংঘের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা? এর উত্তরে একটি নোটে নিরঞ্জন সেন গণনাট্য সংঘের বেশ কিছু ভুলত্রুটি স্বীকার করে নেন।^{৯৯} প্রশ্নটির উত্থাপন কেন হয়েছিল জানা যায় না, কিন্তু গণনাট্য সংঘে মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রভাব যে আরও ব্যাপক হতে পারে তার ইঙ্গিত এই প্রশ্নোত্তরে লুকিয়ে ছিল।

গণনাট্য সংঘের কার্যক্রম—১৯৫৪ সাল :

১৯৫৪ সালের ১০ মে 'বহুরূপী' প্রযোজনা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটক। পরিচালনায় শম্ভু মিত্র। শস্ভু মিত্রের নেতৃত্বে 'বহুরূপী' এর আগেই 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার', 'চার অধ্যায়', 'দশচক্র' প্রযোজনা করে নাট্যমহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। 'রক্তকরবী'-র অভিনয়শৈলী ও প্রযোজনা বাংলা থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের নাটককে অন্য মাত্রায় সংযোজিত করেছিল। উল্লেখ্য যে শস্ভু মিত্রসহ অনেকেই ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করেছিল। রাজনৈতিক আদর্শ ব্যতিরেকে শস্ভু মিত্রের ভিন্নপন্থী শিল্পের প্রচেষ্টা নিয়ে বিতর্কের অন্ত ছিল না। পরে আরও বড়ো প্রেক্ষাপটে 'গণনাট্য' বনাম 'নবনাট্য' বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তবে পাঁচের দশকের শুরুত্তে এই বিতর্ক এত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। এ-বছর গণনাট্য সংঘের তরফ থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাটক প্রযোজিত হয়। যেমন- হরিপদ মাস্টার, রাহ্নমুক্ত, বিশে জুন, সূর্যগ্রাস প্রভৃতি।

সুনীল দত্ত রচিত 'হরিপদ মাস্টার' নাটকটি ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। নাটকটি বরাহনগর শাখা প্রথম অভিনয় করে। মূর্শিদাবাদে, বহরমপুরে পুলিশ এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেয়।^{১০০} ২৬ ডিসেম্বর নিকোলস জিয়ারফাসের নাটক অবলম্বনে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বিশে জুন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। আমেরিকায় সোভিয়েত ইউনিউনের গুপ্তচর সন্দেহে জুলিয়াস রোজনবার্গ ও এথেল রোজেনবার্গের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে নাটকটি রচিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ২০ আগস্ট বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত যাত্রাপালা 'রাহুমুক্ত' গণনাট্য সংঘের সাউথ ক্ষোয়াড দ্বারা প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সজল রায়চৌধুরী 'রাহুমুক্ত' নাটকটিকে 'নবান্ন'-র পর সর্বাধিক বলিষ্ঠ প্রযোজনা বলে মনে করেছিলেন।^{১০১} নাটকটিতে অভিনয় করতেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস, হীরেন সেনগুপ্ত, ব্রজসুন্দর দাস, সাধনা রায়চৌধুরী, বীরু মুখোপাধ্যায়, ভূপতী নন্দী, শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দন্ত প্রমুখ। পরিচালনা করতেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। নাটকের পরিচালক লিখছেন, ''যাত্রার মূল বক্তব্য 'যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই'। এই বক্তব্য বলা হয়েছিল রূপকের মাধ্যমে''।^{১০২}

গণনাট্য সংঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলন :

১৯৫৫-র প্রথমার্ধ জুড়ে গণনাট্য সংঘে সাজো-সাজো রব। বারো বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথের অনেক উথাল-পাতাল পরিস্থিতি সামলে প্রথম রাজ্য সম্মেলন। ১৪ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গণনাট্য সংঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সাফল্যে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে সর্বভারতীয় সংগঠনের বাইরেও বাংলায় গণনাট্য সংঘের স্বাধীনসত্তার ব্যাপ্তি ও প্রভাব কতটা বিস্তৃত। ফলে পরবর্তী কালে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কাঠামোটি ভেঙে গেলেও পশ্চিমবঙ্গে গণনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল।

সম্মেলনের মণ্ডপটি উৎসর্গ করা হয়েছিল গণনাট্য সংঘের অন্যতম স্থপতি ও প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি প্রয়াত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়েছিল সমবেত সংঘ-সংগীত 'এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর—'। উদ্বোধনী বক্তা ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী।^{১০৩} অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শিশির ভাদুড়ী, সোভিয়েত নৃত্যশিল্পী মুকারাম তুর্গনকয়েভা।^{১০৪} সম্মেলন থেকে রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন শচীন সেনগুপ্ত। সহ-সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, নিবারণ পণ্ডিত, শোভা সেন, জ্ঞান মজুমদার, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখ। সাধারণ সম্পাদক হন কমল মিত্র; যুগ্ম সম্পাদক নির্মল ঘোষ ও সজল রায়চোধুরী।^{১০৫} সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৮০০ প্রতিনিধি যোগ দেন।

সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় এই মুহূর্তে গণনাট্য সংঘের কাজ ১৮৭৬ সালের 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন', প্রি-সেন্সরশিপ, প্রমোদকর রদের জন্য আন্দোলন করা এবং গ্রামাঞ্চলে লোককলার বিকাশ সাধন ও শহরের নাটকে আঙ্গিকের মান উন্নয়ন করা। ১৯৫৫-র রিপোর্ট অনুযায়ী সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৮১টি ইউনিট সক্রিয়। সদস্য সংখ্যা প্রায় ২২০০। কিন্তু তার মধ্যে কলকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান জেলার শাখাগুলি ছাড়া অধিকাংশই সক্রিয় নয়। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গণনাট্য শাখাগুলিকে জাগিয়ে তোলা ও নতুন শাখা বিস্তারও সাংগঠনিক

কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়।^{১০৬} সম্মেলন থেকে গণনাট্য সংঘের ইতিহাস রচনার জন্য সুধী প্রধানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়।^{১০৭} কিন্তু সে-কাজ সম্পূর্ণ হয়নি।

৫ দিন ব্যাপী সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তালিকা ছিল বেশ সমৃদ্ধ। বিশেষ করে লোকশিল্পচর্চার এরকম মেলবন্ধন বাংলায় আগে কখনও হয়নি। ১৯৯৩ সালে গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি থেকে প্রকাশিত 'গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে তার পুরো তালিকা তুলে ধরা আছে। সম্মেলনে গণনাট্য সংঘের আনন্দম শাখা মঞ্চস্থ করে তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি', কলকাতা শাখা মঞ্চস্থ করে 'আজকাল' ও 'রাহ্মুক্ত', ব্যারাকপুর শাখা মঞ্চস্থ করে পানু পালের 'নিশানা'। এছাড়া আমন্ত্রণমূলকভাবে লিটল থিয়েটার 'ম্যাকবেথ' মঞ্চস্থ করে।^{১০৮} সারা বছর জুড়ে অভিনীত হয় সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদকৃত শেকসপিয়রের নাটক 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস', ব্রিটিশ নাটককার এ এ মিলনের 'ডিয়ার ডিপার্টেড' অবলম্বনে উমানাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদকৃত 'পয়োমুখম' (প্রযোজনা অনশীলন শাখা), মণীন্দ্র মজুমদারের নাটক 'সম্রাট' (প্রযোজনা উত্তর কলকাতা শাখা)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'তপতী' মঞ্চস্থ করে দক্ষিণ কলকাতা শাখা এবং 'গৃহপ্রবেশ' নাটক মঞ্চস্থ করে নৈহাটি শাখা।

সম্মেলনে ঋত্বিক ঘটকের অনুপস্থিতি তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের চোখে পড়েছিল। ১৯৫৪-র জুন মাসে আইপিটিএ-র পক্ষ থেকে ঋত্বিক ঘটকের আচরণ নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মদ্যপান, প্রতারণা, ট্রটস্কিপন্থাচর্চা ইত্যাদি মোট ২৩টি অভিযোগ আনা হয়। মূল অভিযোগকারী নিরঞ্জন সেন ও নির্মল ঘোষ। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে ঋত্বিক ঘটক একটি দীর্ঘ চিঠি দেন রাজ্য পার্টিকে।^{১০৯} কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ১৯৫৫-তেই গণনাট্য সংঘ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। এর আগে সলিল চৌধুরী ও উৎপল দত্ত-ও সংঘ ত্যাগ করেছিলেন। ১৯৫৫-র শেষে কলকাতায় আসেন রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুন্চেভ ও রাশিয়ার পার্টি প্রধান নিকোলাই বুলগানিন। কলকাতায় তাঁদের জনসভায় গণনাট্য সংঘ সংগীত পরিবেশনা করে।^{১১০}

১৯৫৬-র জানুয়ারি থেকে শুরু হয় 'বাংলা-বিহার সংযুক্তি'র বিরুদ্ধে আন্দোলন। ১৬ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় সিপিআই-এর সপ্তম রাজ্য সম্মেলন।^{১১১} এপ্রিল মাসে পালঘাটে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। নেহরু, কংগ্রেস, ভারতের সমাজের মূল চরিত্র নিয়ে বিতর্কের মধ্যে এই সম্মেলন থেকেই দুটি বিরোধী ভাবধারার অস্তিত্ব টের পাওয়া শুরু হয়। এ-বছরই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হয়। ডিসেম্বরে চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর ভারত সফরে নেহরুর গুণগান ও একই সময়ে চিন-রাশিয়ার মতাদর্শগত পার্থক্যের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব আরও বেশি প্রকট হতে থাকে। কিন্তু ১৯৫৭-র ভোটের দামামায় বিতর্কের আবহ চাপা দিয়ে শুরু হয় সাংবিধানিক ক্ষমতা দখলের লড়াই।

গণনাট্য সংঘের কার্যক্রম—১৯৫৬-৫৭ সাল :

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় ব্যালে ট্রুপের প্রযোজনায় নৃত্যানুষ্ঠান হয় 'এক পয়সার ভেঁপু'। রচনা অনল চট্টোপাধ্যায়, সংগীত অভিজিৎ, নৃত্য পরিকল্পনা শম্ভু ভট্টাচার্য।^{১১২} সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা অবলম্বনে শম্ভু ভট্টাচার্যের 'রানার' ও 'অবাক পৃথিবী' নৃত্য গণনাট্য সংঘের অন্যতম সম্পদ ছিল। এ-বছরের ১৬ মার্চ পাইকপাড়ায় অভিনীত হয় 'নয়া তুঘলক'। উত্তর কলকাতা শাখা ১৮ মার্চ প্রযোজনা করে 'যমরাজের দরবার' নামে একটি কৌতুকনাট্য। ধীরেন্দ্রনাথ দাসের 'গাঙ্গুলিমশাই' মঞ্চস্থ হয় এপ্রিল মাসে। সুনীল দত্তের লেখা 'মালাবদল' ও 'শুভদৃষ্টি' নাটকদুটি ১৮ মার্চ মনুমেন্টের পাদদেশে একটি সাংস্কৃতিক সমাবেশে অভিনীত হয়। দুটি নাটকই বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক নাটক। বীরু মুখোপাধ্যায়ের নাটক 'সাহিত্যিক' ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে 'বামুনের মেয়ে' এ-বছরের উজ্জ্বল প্রযোজনা।

১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি মধ্য কলকাতা শাখা দ্বারা মুসলিম ইনস্টিটিউটে 'ইস্পাত' নাটকটি প্রথম প্রযোজিত হয়। মূল কাহিনি রমেন ঘোষ দন্তিদার; সম্পাদনা ও নির্দেশনা মমতাজ আহমেদ খাঁ। অভিনয় করেন চারুপ্রকাশ ঘোষ, বারীন বোস, কালী ব্যানার্জি প্রমুখ। নাটকটি শ্রমিক

আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এছাড়াও এ-বছর অগ্নিমিত্রের 'নবজন্ম', তুলসী লাহিড়ীর 'নাট্যকার', মিখাইল সেবান্তিয়ানের 'স্টপ নিউজ' অবলম্বনে উমানাথ ভট্টাচার্যের লেখা 'শেষ সংবাদ' প্রভৃতি নাটক প্রযোজিত হয়।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে লড়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, পিডব্লুপি, পিপলস ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট, প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির 'ইউএলইসি' জোট তৈরি হয়। মোর্চার তরফ থেকে 'পশ্চিমবঙ্গে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্টের খসড়া কর্মসূচি'-তে 'প্রকৃত জাতীয় সরকার' গঠনের ডাক দেওয়া হয়।^{১১৩} এই কর্মসূচিতে 'সংস্কৃতি ও চারুকলা'র উন্নতির ক্ষেত্রে বলা হয়,

"গভর্নমেন্ট শিল্প ও সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। নাট্যাভিনয়-আইন রদ করানোর জন্য সচ্চেষ্ট হইবে।

বাংলা নাটকের উন্নয়নের জন্য গভর্নমেন্ট জাতীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে সাহায্য করিবে। সৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ের অভিনয়ে প্রমোদ-কর তুলিয়া দেওয়া হইবে।

লোকসংগীত ও নৃত্যের সমৃদ্ধির জন্য সব রকম সাহায্য করিবে।"^{>>8}

নির্বাচনের ফলাফল জোটের পক্ষে যায়নি। লোকসভায় কংগ্রেসের ৩৭১টি আসনের বিপক্ষে জোট পেয়েছিল ৫৪টি আসন, যার মধ্যে অর্ধেক ছিল সিপিআই-এর।^{১১৫} রাজ্য থেকে জয়লাভ করেন ৭ জন। বিধানসভায় কংগ্রেস পায় ১৫২টি আসন, সিপিআই ৫১টি।^{১১৬} পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব না হলেও কেরলে ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গড়া সম্ভব হয়। কিন্তু ১৯৫৯ সালের ৩১ জুলাই সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে কমিউনিস্ট সরকার ফেলে দেওয়ার পর কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।^{১১৭}

নির্বাচন উপলক্ষ্যে গণনাট্য সংঘ ১৯৫৬-৫৭ সালে বেশ কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করে। নির্মল ঘোষের 'ভোকাট্টা', পানু পালের 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' ও 'জয়পরাজয়', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব', উৎপল দত্তের 'সমাজতন্ত্র', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'লম্বকর্ণ', কালীপ্রসাদ

b8

রায়চৌধুরীর 'ভোট পাঁচালী' ও 'আর নয়', শান্তিশেখরের 'কালনেমির লঙ্কাভাগ', সুনীল দত্তের 'বিপুলার সংসার' ও 'ভাঙাতরী' সেগুলির মধ্যে অন্যতম।^{১১৮}

নির্বাচনী প্রচার ছাড়াও ১৯৫৭-র সারা বছরই গণনাট্য সংঘ সাংস্কৃতিক কাজে ব্যাপ্ত ছিল। জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা জেলা কনভেনশন। ৭ জুলাই বীরু মুখোপাধ্যায়ের লেখায় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রান্তিক শাখা দ্বারা অভিনীত হয় 'সংক্রান্তি' নাটক। প্রযোজনাটি গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পায়।^{১১৯} ওই মাসেই রাজাবাজার শাখার প্রকাশ্য সম্মেলনে প্রথম অভিনীত হয় মন্মথ রায়ের 'টোটোপাড়া'। ডিসেম্বরে গণনাট্য সংঘের অষ্টম সর্বভারতীয় সম্মেলনে অভিনীত হয় দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ'। নাটকটি সম্পাদনা করেছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা সুধী প্রধান ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন সময়ে নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দন্ত, চিত্রা মণ্ডল, রেবা রায়চৌধুরী, সজল রায়চৌধুরী, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।^{১২০}

অষ্টম সর্বভারতীয় সম্মেলন ১৯৫৭-৫৮ ও দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন ১৯৫৮ :

গণনাট্য সংঘের সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলনের পরেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল সংঘ তার প্রাথমিক মতাদর্শগত অবস্থান থেকে সরে আসছে। বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই, মানুষকে গণসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা, সংগ্রামী গণসংস্কৃতি তৈরির পথ থেকে খুব ধীরগতিতে গণনাট্য সংঘের মুখ ঘুরে যাচ্ছিল। অন্তত সর্বভারতীয় সংগঠনের তাত্ত্বিক পরিকল্পনায় তারই আভাস পাওয়া যায়। ১৯৫৭-তে গণনাট্য সংঘের 'সংগীত-নাটক আকাদেমি' স্বীকৃতি পাওয়া নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। পার্টি ও সংঘের অন্দরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি নিয়ে ফাটল ক্রমেই প্রকাশ্য হয়ে উঠতে থাকে। নির্বাচনমুখী রাজনীতির উপর আস্থাশীল কমিউনিস্ট পার্টিও জোটনির্ভর সহাবস্থানের বাণী প্রচারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অষ্টম সর্বভারতীয় সম্মেলনের অনেক সাফল্যের মধ্যেও দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

গণনাট্য সংঘের অষ্টম সম্মেলন দিল্লির রামলীলা ময়দানে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৭ থেকে ১ জানুয়ারি ১৯৫৮ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তিনজন ও চিন থেকে দুই জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে সভাপতি নির্বাচিত হন নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত; সম্পাদক পদে পুনর্নিবাচিত হন নিরঞ্জন সেন। কোষাধ্যক্ষ সজল রায়চৌধুরী। জাতীয় কার্যকরী সমিতিতে যুক্ত হন বিমল রায় ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংঘের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত ১৯৫৮-র ৬ জুন থেকে ৮ জুন হাওড়ার সালকিয়ায়। রাজ্যের ১১টি জেলা থেকে ৮৭০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।^{১২১} এর আগে এপ্রিল মাসে দমদম, পাতিপুকুর, এয়ারপোর্ট, গোরাবাজার, নাগেরবাজার পাঁচটি ইউনিটের সম্মেলন থেকে নির্মল ঘোষকে সভাপতি ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।^{১২২} দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক হন সজল রায়চৌধুরী ও সহ-সম্পাদক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৫৮ সালের মার্চে দমদম শাখার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান', অমর গাঙ্গুলির 'জীবন যৌবন' ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'পান্থশালা'। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দমদম শাখা প্রযোজিত 'পান্থশালা' নাটকটি আন্তন চেকভের 'অন দ্য হাই রোড' অবলম্বনে রচিত। অভিনয় করতেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারমণ দফাদার, রমেন ভাদুড়ী, বিভা ভট্টাচার্য প্রমুখ। মে মাসে মধ্যমগ্রাম চারণ সাহিত্য চক্রের সম্মেলনে নৃত্যনাট্য, লোকনৃত্য ছাড়াও মন্মথ রায়ের 'আজব দেশ' ও সৌমেন সেনের 'একালের গল্প' নাটকদুটি অভিনীত হয়। এই মাসেই রাজাবাজার শাখা ধীরেন্দ্রনাথ দাসের নাটক 'অপরাজিতা' মঞ্চস্থ করে। আগস্ট মাসে অভিনীত হয় ধীরেন্দ্রনাথ দাসের 'এই তো নাটক', পানু পালের 'বিচার' (প্রযোজনা দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতা শাখা)। 'বিচার' নাটকটি খাদ্যসমস্যার উপর ভিত্তি করে রচিত। সোদপুর শাখার 'নতুন প্রভাত' নাটক ও সঞ্চারী শাখার 'শেষ বিচার' যাত্রা এ-বছরের শেষে মঞ্চস্থ হয়।^{১২৩} এছাড়া সারাবছর জুড়েই পুরনো নাটকগুলির প্রযোজনা অব্যাহত ছিল।

খাদ্য আন্দোলন ও ১৯৫৯ সালের নাট্য-প্রযোজনা :

১৯৫৯—ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের বছর। স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু হওয়া চোরাবাজারির ঐতিহ্য এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছোয় যে বাংলায় আরেকটি মন্বন্তরের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। সরকারি উদাসীনতা, চোরাবাজারি ঠেকানোর অক্ষমতা, কৃষিক্ষেত্রে ভ্রান্ত নীতির বলি হতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। ১৯৫৯-এর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে বাংলায় প্রায় ৮০ জন মানুষ অনাহারে মারা যায়। ১৯৫৯-এ বামদলগুলির মিলিত সংগঠন 'মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'র নেতৃত্বে শুরু হয় খাদ্য আন্দোলন। ৩১ আগস্ট প্রায় তিন লক্ষ মানুষের মিছিল কলকাতার রাজভবন অভিমুখে এগোলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলিচালনা শুরু করে। এর প্রতিবাদে পরদিন থেকে চলে লাগাতার ধর্মঘট। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০, আহত ৩০০০ জন, নিখোঁজ ১২০ জন ও গ্রেপ্তার ২০০০০।^{১২৪} ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্টের কর্মসূচি প্রচারের জন্য পানু পালের 'কত ধানে কত চাল' পথনাটকটি রচিত ও অভিনীত হয়। এতে অভিনয় করেছিলেন মমতাজউদ্দিন আহমেদ, উমানাথ ভট্টাচার্য ও পানু পাল স্বয়ং।

১৯৫৯ সালে গণনাট্য সংঘ রাজ্যের জেলায়-জেলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। জানুয়ারিতে ব্যারাকপুর গণনাট্যোৎসবে চারদিনে ৮টি নাটক অভিনীত হয়। যার মধ্যে নতুন নাটক ছিল অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বান্দ্বিক', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা' প্রভৃতি নাটক। 'মা' নাটকটি ফার্গ্রসনের 'ক্যাম্পবেল অফ গিলমোর' অবলম্বনে কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। মধ্যমগ্রামের একটি উৎসবে অভিনীত হয় সলিল সেনের 'মৌচোর', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'প্রায় নাটক'। মে মাসে শান্তিপুরে মঞ্চস্থ হয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (প্রযোজনা পাতিপুকুর শাখা)। নভেম্বরে 'ঘুঘুডাঙা শাখা' মঞ্চস্থ করে পরেশ ধরের নাটক 'শুধু ছায়া'। 'শুধু ছায়া' নাটকটি ইতালীয় নাট্যকার পিরানদেল্লোর 'সিক্স ক্যারেকটার ইন সার্চ অফ অ্যান অথোর' নাটকের আঙ্গিকের আদর্শে রচিত। নাগেরবাজার শাখা প্রযোজনা করে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি'। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য ও দিলীপ সেনগুপ্তের 'কাজ নেই' নৃত্যনাট্য বছরের নানা সময়ে অভিনীত হয়।

গণনাট্য সংঘের রাজ্য নাট্যোৎসব ১৯৬০ ও ১৯৬১ এবং অন্যান্য নাট্যাভিনয় :

গণনাট্য সংঘের ষাটের দশকের সূত্রপাত হল মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কুপ্রভাব ও সিপিআই-এর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের ফলে পার্টি প্রায় ভাঙনের কিনারায় এসে পৌঁছোয়। গণনাট্য সংঘও বিতর্কের রেশ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। আদর্শগত দীনতা ও সাংগঠনিক অবক্ষয় খুব ধীর গতিতে হলেও গণনাট্য সংঘকে শক্তিহীন করে তুলছিল। দুর্বলতা সত্ত্বেও ১৯৬০ ও ১৯৬১-তে দুটি গণনাট্য উৎসব এবং রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান দু'টি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সজল রায়চৌধুরী লিখছেন,

"...অনেক বন্ধুদেরও মনে হয়েছে গণনাট্য সংঘ মনোমালিন্যে ভেঙে গিয়েছে। আহা, সে আইপিটিএ কি আর আছে? আছে যে বহাল তবিয়তেই তা প্রমাণের জন্যেই ষাটের প্রথম চারমাস একটি গণনাট্যোৎসবের প্রস্তুতি।"^{>২৫}

১৯৬০ সালের ১৪-২০ এপ্রিল গণনাট্য রাজ্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় রঞ্জি স্টেডিয়ামে (বর্তমানে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম)। উৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক সজল রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি 'নীলবিদ্রোহ শতবার্ষিকী স্মরণে' উৎসর্গ করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন পৌরপ্রধান বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়শঙ্কর ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভাপতি শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞ্জ।^{১২৬} অনুষ্ঠানে একটি স্যুভেনিয়র ছাপা হয়, যার অলংকরণ করেছিলেন খালেদ চৌধুরী। ১৯৬০-এর নাট্যোৎসবে অভিনীত হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (প্রযোজনা প্রান্তিক শাখা), স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে সজল রায়চৌধুরীর নাট্যরূপ 'চন্দন ডাঙার হাট' (প্রযোজনা হাওড়া শাখা), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা' (প্রযোজনা সঞ্চারী শাখা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শান্তি' (প্রযোজনা চন্দননগর শাখা), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজন্দৌলা' (প্রযোজনা রাজ্য উৎসব কমিটি)। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য, রামেন্দ্র দেশমুখের রচনা ও অসিত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'জীবন জয়ের গান' নৃত্যনাট্য, ভীত্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের উচ্চাঙ্গসংগীতের আসর এবং লোকসংগীত-লোকনৃত্য-শাস্ত্রীয় নৃত্য

চ৮

প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। সারা বছর ধরে অভিনীত নতুন নাটকগুলি হল বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'ভাঙা-গড়া খেলা' (প্রযোজনা প্রান্তিক শাখা), চিররঞ্জন দাসের 'নীলদরিয়া' (প্রযোজনা দমদম নাগেরবাজার শাখা), কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘন্টা', চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দাও ফিরে সে অরণ্য (প্রযোজনা নাগেরবাজার শাখা ও ঘুঘুডাঙা শাখা), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগন্তুক প্রভৃতি। নভেম্বরে রঙ্গনা মঞ্চে আয়োজিত একাঙ্ক নাট্যোৎসবে গণনাট্যের বিভিন্ন শাখা পরিবেশন করে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপচয়', 'কেউ দায়ী নয়', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'উপসংহার', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আজকের উত্তর'।

১৯৬১ সালে রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাজ্য গণনাট্যোৎসবের সভাপতি ছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বোধন করেছিলেন ড. ধীরেন সেন। উৎসবে অভিনীত হয়েছিল কালী রায়চৌধুরীর 'আফ্রিকা', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেতুবন্ধ', শচীন সেনগুপ্তের 'কালো টাকা' (প্রযোজনা চারণ সাহিত্য চক্র) প্রভৃতি নাটক।^{১২৭} ৩-১২ নভেম্বর পার্ক সার্কাস ময়দানে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী পালিত হয়।^{১২৮} ১৯৬১ সালে অভিনীত হয় বীরেন্দ্র মিত্রের 'আসামী' ও 'শেষ বিচার' (প্রযোজনা সঞ্চারী শাখা), চিররঞ্জন দাসের 'জানোয়ার' (প্রযোজনা দমদম নাগেরবাজার শাখা), মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'জননী' (প্রযোজনা দেশবন্ধুনগর শাখা), ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মরুঝঞ্ঝা' (প্রযোজনা ঘুঘুডাঙা শাখা) প্রভৃতি নাটক। সারা রাজ্য জুড়ে গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন শাখা এ-বছর অসংখ্য নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৯৬১ সালের ১২ নভেম্বর 'নান্দীকার' নাট্যদল প্রযোজনা করে পিরানদেল্লোর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'। নাট্যরূপ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও নির্দেশনা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ন্যাচারলিস্ট পিরানদেল্লো ছিলেন ইতালির ফ্যাসিস্ট পার্টির নেতা মুসোলিনীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর সৃষ্টি করা এমন একটি নাটক যেখানে শুধুই ধনতান্ত্রিক সমাজের আশাবাদ রহিত গ্লানি, সেরকম একটি নাটক 'নান্দীকার' দ্বারা অভিনীত হওয়ায় বিতর্কের ঝড় ওঠে। প্রসঙ্গত গণনাট্য সংঘের 'নান্দীকার' শাখা তেঙেই নাট্যদলটির সূত্রপাত। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য কর্মী থাকলেও এ-নাটক অভিনয়ের আগেই সংঘ ছাড়েন।^{১২৯}

গণনাট্য সংঘ ১৯৬২ :

১৯৬২ সালের শুরুতে বোঝা যায়নি বছরের শেষে বিগত কুড়ি বছরের গণসংস্কৃতি আন্দোলনের পরিণতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট বিধানসভায় ৭৭টি আসনে জয়লাভ করেছিল। যার মধ্যে সিপিআই-এর একার ছিল ৪৯টি আসন।^{১৩০} যদিও পার্টিতে ভাঙন তখন নিতান্ত সময়ের অপেক্ষা। মতাদর্শের সংঘর্ষের মধ্যে গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ধীরে ধীরে স্থিমিত হয়ে পড়ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যথার্থ সংযোগের অভাবে জেলা শাখাগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ১৪৪ ধর্মতলা স্ট্রিটে রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভা গণনাট্য সংঘের শেষ সাংগঠনিক কর্মসূচি রূপে চিহ্নিত হল।^{১৩১} এ-বছরের নাট্য-প্রযোজনার স্বল্পতা আগত ভাঙনেরই প্রমাণ।

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দ মোটর কারখানায় ৬০ দিন ব্যাপী ধর্মঘট শুরু হয়। সেই ঘটনা নিয়ে ১৯৬২-র শুরুতে উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকটি অভিনীত হয়। একই ঘটনা নিয়ে সজল রায়চৌধুরী লিখেছিলেন 'অগ্নিক্ষরা' নাটক। তাঁর আরেকটি নাটক 'অছিমদ্দির গরু' রচিত হয়েছিল বর্ধমানের ক্যানেল কর আন্দোলনের ঘটনা নিয়ে। এছাড়াও অভিনীত হয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও', বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা 'উজান যাত্রা' প্রভৃতি নাটক।

১৯৬২ সালের অক্টোবরে শুরু হয় চিন-ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষ। সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য সংঘ যে রাজনৈতিক অবস্থান নেয়, তাতে তাদেরকে 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। জারি হয় 'ভারতরক্ষা আইন'। সংঘের মধ্যেও পুরনো রাজনৈতিক মতান্তর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মনান্তরে পরিণত হয়। 'ছুটি' নেন সম্পাদক সজল রায়চৌধুরী। সেই স্থানে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নির্মল ঘোষ। ডিসেম্বরে প্রফুল্ল সেন সরকার ১৮৭৬ সালের নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনটিকে আরও শক্তিশালী করে প্রয়োগের চেষ্টা করে। মিনার্ভায় উৎপল দন্তের 'কল্লোল' নাটকের উপর নেমে এল চূড়ান্ত আক্রমণ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল পরবর্তী কয়েক বছরে গণনাট্য সংঘ লড়তে হবে অসীম শক্তিধর অসংখ্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

চতুর্থ পর্ব :

গণনাট্য সংঘে ভাঙন ও পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া :

চারের দশকের শেষ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শুরু হওয়া মতাদর্শের সংগ্রাম পুনরায় জেগে ওঠে ১৯৫৬ সালের পালঘাট সম্মেলনে। জওহরলাল নেহরু ও ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ে পার্টির একপক্ষের মনে হয়েছিল "শাসক শ্রেণিগুলির মধ্যে নেহরু হইতেছেন সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল"।^{১৩২} দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইংল্যান্ড-আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বদলে রাশিয়ার সঙ্গে নেহরুর হাত মেলানো তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ। তাঁদের মনে হয় মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও আমলাতন্ত্রের কারণে নেহরুকে বিভিন্ন বিষয়ে আপসের রাস্তা নিতে হয়। তাই "কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হবে নেহরুর আপসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। প্রধান আক্রমণ চালাতে হবে প্রতিক্রিয়াশীলদের উপর।"^{১৩৩} চিনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির ফলে নেহরুর শান্তিনীতিরও প্রশংসা করা হয়। বিশেষ করে ভারত যেভাবে 'সিয়াটো' চুক্তির পুঁজিবাদী প্রলোভনকে অস্বীকার করে ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা করেছে সেটি প্রশংসার যোগ্য।^{১৩৪} অন্যদিকে আরেক পক্ষের মনে হয়েছিল ভারতবর্ষ আজও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-বুর্জোেয়া।^{১৩৫} তাঁদের মতে,

"ভারতীয় কংগ্রেস দল হল শাসক দল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে আপসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, আমলাতন্ত্র ও পুলিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, গণতন্ত্রের বিস্তার সাধনের সংগ্রামে জনগণকে লড়াই চালাতে হবে সরকার ও কংগ্রেসের কর্মনীতির বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় কংগ্রেসের সঙ্গে সাধারণ ঐক্যবদ্ধ মোর্চার কথাই ওঠে না।"^{১৩৬}

পালঘাট সম্মেলনে গণতান্ত্রিক শক্তি ও সরকারের প্রগতিশীল অংশের মিলনে একটি 'জাতীয় ফ্রন্ট' গঠন গড়ার প্রস্তাব নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়। বলা হয় নির্বাচনের মাধ্যমে তৈরি "জনগণতন্ত্র হইতেছে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার পথ"।^{১৩৭} বিভেদ সৃষ্টি হয় কাদের সঙ্গে জোট তৈরি করা হবে সেই বিষয় নিয়ে। যারা নেহরু তথা কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে জোটের পক্ষপাতী ছিলেন, তারা চেয়েছিলেন জাতীয় বুর্জোয়া, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের মিলিত জোট। তাদের পরিচয় ছিল

'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট'।^{১৩৮} অন্যদিকে একদল নেহরুকে বৃহৎ পুঁজিপতির প্রতিভূ রূপে দেখতেন। ফলে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে হাত মেলানোয় তাঁরা রাজি ছিলেন না। এছাড়া একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য হয়। আন্তর্জাতিক ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তনের ফলে পার্টির একতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোভিয়েত না চিন–এই বিতর্কে ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে ফাটল ব্যাপক রূপ নিতে থাকে।

১৯৫৭-তে আকসাই চিনে রাস্তা নির্মাণের পর ১৯৬০ সালে ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে চিন ভারতের সীমান্তে ঢুকে আসে। সীমান্ত সংকট নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি স্পষ্ট মতামত রাখেনি। যা নিয়ে পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব আবার প্রকট হয়ে ওঠে। যারা চিনের 'জাতীয় সংগ্রামের তত্ত্ব' আঁকড়ে ধরে নেহরুকে 'বুর্জোয়ার রক্ষক' বলে মানতেন, তাঁদের পরিচয় হল 'সংকীর্ণতাবাদী'। অন্যদিকে নেহরুর প্রগতিশীলতা ও রাশিয়ার শান্তিনীতিতে আস্থাবানরা অপর পক্ষের কাছে হয়ে গেলেন 'সংস্কারবাদী'। সাধারণ পার্টি কর্মী ও জনতার কাছে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেল যথাক্রমে 'চিনপন্থী' ও 'রুশপন্থী' নামে। ১৯৬২-র নির্বাচনকে সামনে রেখে ভাঙন ঠেকানো গেলেও 'বিকল্প সরকার'-এর ডাক সফল হয়নি।

১৯৬২ সালের অক্টোবরে শুরু হল ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ। পলিটব্যুরোর তরফ থেকে স্পষ্টভাষায় চিনের ভারত আক্রমণের নিন্দা করা হল। পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তখনও আলোচনার দাবিতে অনড়। তাঁদের মতে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের আক্রমণের পিছনে ভারতের প্রচ্ছন্ন প্ররোচনা রয়েছে।^{১৩৯} সীমান্ত সমস্যার ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরে জারি করা হল 'ভারতরক্ষা আইন'। 'দেশদ্রোহী' কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হল। যাঁদের মধ্যে ১১ জন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য, ৫০ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য, ১০ জন লোকসভার সদস্য ও ৪০ জন বিধানসভার সদস্য ছিলেন।^{১৪০} সীমান্ত শান্ত হয়ে গেলেও কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৬৩ সালে সমর মুখার্জি পৃথ্বীরাজ ছদ্মনামে 'পার্টির সামনে গুরুতর সংকট' শিরোনামে একটি দলিল লেখেন। সেটিতে তিনি 'উগ্র-জাতীয়তাবাদী' নেহরুপন্থী 'সংশোধনবাদী'-দের থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী ভাবমূর্তি রক্ষা করার ডাক দেন।^{১৪১} ১৯৬৪-র মার্চ মাসে জাতীয় মহাফেজখানা থেকে পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের ১৯২৪ সালে ইংরেজ সরকারকে লেখা 'মুচলেকা' আবিষ্কৃত হয়।^{১৪২}

১৯৬৪-র তেনালি কনভেনশনে পার্টি ভাঙার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হল। জাতীয় পরিষদ বিরোধী ৩২ জন পার্টি সদস্য 'প্রকৃত বামপন্থী' পার্টি গড়ার ডাক দেন। পশ্চিমবঙ্গে এঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল সদস্য-সমর্থক সংখ্যায় অধিক ছিল। দুই পক্ষ আলাদাভাবে পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করে। ১৯৬৫-র কেরালা বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআই এবং সিপিআই (মার্কিস্ট) আলাদাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রথম দলটি পুরনো 'কাস্তে ধানের শিষ' চিহ্ন বজায় রাখে এবং দ্বিতীয় দলটির নতুন চিহ্ন হল 'কাস্তে হাতুড়ি তারা'। কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন আর জোড়া লাগেনি। বাংলা তথা ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনও এরপর শতধারায় বিভক্ত হয়ে যায়।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ১৯৬২-৬৪ :

অক্টোবরে চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ ও ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগের পর বাংলার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিকদেরও আক্রমণ করা শুরু হয়।

চিন-ভারত সীমান্ত সমস্যার সময় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অম্লান দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখরা 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' নামক একটি সংগঠন তৈরি করেন। চিনের বিরুদ্ধে বিষোদগারের পর শুরু হয় বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ। 'দেশ' পত্রিকায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা'য় চিনের সঙ্গে এদেশের বামপন্থীদের যোগসাজশ নিয়ে ধারাবাহিক কলাম প্রকাশিত হত। শ্রী কমলাকান্ত শর্মা ছদ্মনামে প্রমথনাথ বিশী সিপিআই(এম) নেতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ

কবিতা লিখতেন। দেশের জাত্যভিমান রক্ষার দায়িত্ব ক্রমে ব্যক্তিগত কুৎসার পর্যায়ে নেমে আসে। এমনকি সত্যজিৎ রায়ের ভূমিকা নিয়ে 'দেশ' পত্রিকা প্রশ্ন তোলে 'সত্যজিৎ রায় নীরব কেন?'^{১৪৩}

১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় 'শুভবুদ্ধির আহ্বান' প্রবন্ধে নেহরুর নীতির প্রশংসা করেন। বামপন্থী মহলের একাংশ থেকে চিন-ভারত যুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য দেশাত্মবোধক নাটক রচিত ও প্রযোজিত হয়েছিল। ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'সৈনিক', গিরিশঙ্করের 'বেঙা ডাক্তারের চোখ', সুনীল দত্তের 'সীমান্ত প্রহরী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লগ্ন', রমেন লাহিড়ীর 'অমর', প্রীতি রায়ের 'রক্তপদ্ম', গণনাট্য সংঘের সভাপতি দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সীমান্তের ডাক' প্রভৃতি নাটকে দেশাত্মবোধের ধ্বজা ওড়ানো হয়। ভূপেন হাজারিকা, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখের গানেও একই বক্তব্য উঠে আসে। সীমান্ত সংকটের অব্যবহিত কাল পরেই ডিসেম্বর মাসে রাজ্য সরকার নতুন নাট্যবিল চালু করে প্রগতিশীল নাট্যমঞ্চকে হত্যা করার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আসে। ১৯৬২-র নাট্য বিলে শুধুমাত্র বাম কণ্ঠস্বরের বিপদ ছিল না, লাইসেঙ্গের জটিলতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে অন্যান্য নাট্যদলগুলিও বিপদের মুখে পড়ে। 'সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলন'-এর পক্ষ থেকে ১৩ মে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়। গণনাট্য সংঘ, পেশাদার নাট্যমঞ্চ, গ্রুপ থিয়েটারগুলি পারস্পরিক মতানৈক্য সত্ব্বেও নাট্য বিল খারিজ করার বিষয়ে সম্মতিদান করে।

ভাঙনের মুখে গণনাট্য সংঘ :

বাংলার গণনাট্য সংঘের তখন অবস্থা কীরকম? কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব গণনাট্য সংঘের ভিতরে অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। নীতিগত পার্থক্য, সন্দেহ-বিদ্বেষের প্রভাব ও পুলিশি অত্যাচার থেকে বাঁচতে পুরনো মুখের অনেকেই সংঘ থেকে বেরিয়ে যান। অনেকে গ্রেপ্তার হন। যুদ্ধকালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির নীতি অনুসারে গণনাট্য সংঘ দেশাত্মবোধের জোয়ারে ভেসে

\$8

পড়েনি। ফলে উগ্র দেশপ্রেমের মধ্যে গণনাট্য সংঘ বিপজ্জনকভাবে একা ও অসহায়। সংগঠক-শিল্পী-নাটকের অভাবে গণনাট্য সংঘ ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল।

গণনাট্য সংঘের তখন মাত্র দুটি শাখা সক্রিয়—সীমান্তিক শাখা ও সাম্প্রতিক শাখা। 'সীমান্তিক শাখা' ১৯৬১ সালে চিররঞ্জন দাসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্প্রতিক শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য ঘোষ, জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুশীল সেন। ১৪৪ প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৩ সালের ১২ মে। 'সাম্প্রতিক' আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘ অনুমোদিত শাখা ছিল না। কোনো জেলা কমিটি, রাজ্য কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি সক্রিয় ছিল না যারা নতুন শাখাকে অনুমোদন দিতে পারে। ওই বন্ধ্যা সময়ে গণনাট্য সংঘের নতুন কোনো শাখা তৈরি হওয়া ছিল আশ্চর্যজনক। এমনকি তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে সাম্প্রতিক শাখা নিজেদের 'গণনাট্য' পরিচয় থেকে দূরেই রেখেছিল।^{১৪৫} ১৯৬৩-র ডিসেম্বরে 'সীমান্তিক শাখা' দ্বারা আয়োজিত 'রাজ্য গণনাট্য উৎসব'-এর আয়োজন ছিল অত্যন্ত সীমিত। দেশীয় রাজনীতির টানাপোড়েন ও পার্টি-সংঘের সাংগঠনিক বিহ্বলতার মধ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি গণনাট্য সংঘের পুনরুজ্জীবনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। এবারের আয়োজন ব্যালেসহ তিনটি নাটক, রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন, কয়েকটি বক্তৃতা। বক্তব্য রাখেন সুধী প্রধান ও অজিতকুমার ঘোষ। প্রযোজিত হয় পুরনো 'কাজ নেই' ব্যালে, চিররঞ্জন দাসের নাটক 'সন্ত্রাস' ও আন্তন চেকভের কাহিনি অবলম্বনে উৎপল দত্তের 'প্রস্তাব'। 'সন্ত্রাস' নাটকটি চিন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে দেশের অভ্যন্তরে সন্দেহের দমবন্ধ পরিস্থিতি নিয়ে রচিত। ৮ নভেম্বর মিনার্ভায় সাম্প্রতিক শাখার দ্বারা অভিনীত হয় কৌশিক সান্যালের 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র অনুবাদ ও অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি খুনের গল্প'।^{১৪৬}

গণনাট্য সংঘ ১৯৬৪—পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সূচনা :

১৯৬৩-র শেষে গণনাট্য উৎসব আয়োজনের পর সংঘ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরনো শিল্পী-সংগঠকদের অনেকে পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সুধী প্রধানের

মতো অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শর্তসাপেক্ষভাবে ফিরে আসেন। সীমান্তিক, সাম্প্রতিক শাখার পাশাপাশি দেশবন্ধুনগর শাখা, ঘুঘুডাঙা শাখা সক্রিয় হতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের ৮-১০টি শাখা নিয়ে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়।^{১৪৭} সেই সময়ের স্মৃতি থেকে শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

"নিচের দিকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো শাখাগুলি যারা গণনাট্য সংঘের পতাকা তখনও মাটিতে ফেলে দেয়নি—অস্তিত্বরক্ষার জন্য লড়াই করেছে—হাতড়ে হাতড়ে কাছে এসেছে।"^{>৪৮}

১৯৬৪-র এপ্রিলে চিররঞ্জন দাসের সম্পাদনায় 'গণনাট্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটি শেকসপিয়রের চারশোতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা হয়েছিল। শারদোৎসবে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

জুন মাসে নির্মল ঘোষের 'উত্তরী' গ্রুপ 'পদ্মানদীর মাঝি' মঞ্চস্থ করে। পরে 'উত্তরী' নিজেদের গণনাট্য সংঘ থেকে পৃথক করে নেয়। জুলাই মাসে সাম্প্রতিক শাখা 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র পুনরভিনয় করে। অক্টোবর মাসে সিপিআই-এর জাতীয় পরিষদ বিরোধী সদস্যদের সপ্তম কংগ্রেস কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকেই সিপিআই(এম) যাত্রাপথ শুরু হয়। সম্মেলনে গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে সংগীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়া প্রযোজিত হয় চিররঞ্জন দাস রচিত 'সীমান্তিক' শাখার 'মৃত্যুহীন', শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'প্রান্তিক' শাখার 'আত্মহত্যা আইনি কর' ও অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'সাম্প্রতিক' শাখার 'একটি যুদ্ধের ইতিহাস' নাটক। সপ্তম কংগ্রেসে শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল,

"সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজ শুধু আর্টের জন্য আর্ট সৃষ্টি নয়—গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাহায্যে তাঁকে এগিয়ে আসতে হবে। মহিলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাস্তহারা প্রভৃতি ফ্রন্টের দুর্বলতা কীভাবে কাটান যায় নৃতন রাজ্য নেতৃত্বকে তা বিশেষভাবে ভাবতে হবে।"^{১৪৯}

ততদিনে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় শক্তিসঞ্চয়ের কাজ গণনাট্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তখনও সংঘের আতঙ্কের পরিবেশ কার্টেনি। নেতা ও সংগঠকদের অনেকে তখনও জেলবন্দী। তবে জাতীয় পরিষদ

বিরোধী সদস্যদের সপ্তম কংগ্রেস ও দশম রাজ্য সম্মেলনের পর গণনাট্য সংঘ সাংগঠনিক সমর্থন পায়। আদর্শগতভাবে সংঘ কোন 'বামপন্থী' হবে, তারও উত্তর পাওয়া গেল। এর মধ্যেই বছরের শেষে এসে অনেকগুলি শাখা পুনরুজ্জীবিত হয়। প্রান্তিক, মধ্য কলকাতা শাখা, সীমান্তিক, সাম্প্রতিক, দেশবন্ধুনগর, রহড়া, বরাহনগর, আরিয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর, পানিহাটি, শিবপুর, বহরমপুর, মালদহ শাখা ছাড়াও কিছু বন্ধু সংগঠন রূপদর্শী, রূপক, স্বন্তিক, কলাকার, লোকায়তিক, চারণ-সাহিত্য-চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে।^{১৫০}

গণনাট্য সংঘ—পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ১৯৬৫ :

১৯৬৫ সালের ২০ জানুয়ারি মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে কলেজ ক্ষোয়ারের স্টুডেন্টস হলে বিনাবিচারে বামপন্থীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণনাট্য সংঘ নিজের নামে যুক্ত না থাকলেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে একত্রিত করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। তৎকালীন পরিস্থিতিতে বামঘেঁষা মুক্তস্বরকে সোচ্চার করে তোলবার ক্ষেত্রে এই সমাবেশটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।^{১৫১} ১৯৬৫-র ১২ মার্চ মাসে উৎপল দত্তের পরিচালনায় এলটিজি-র প্রযোজনায় মিনার্ভা থিয়েটারে 'কল্লোল' নাটক প্রযোজিত হয়। নাটকে স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা কালিমালিপ্ত করা হয়েছে অপবাদে মিনার্ভায় পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর উপদ্রব শুরু হয়। উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অপবাদে মিনার্ভায় পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর উপদ্রব শুরু হয়। উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বামমনস্ক নাট্যসমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আলোকশিল্পী তাপস সেন স্লোগান তোলেন 'কল্লোল চলছে, চলবে'। ২২-৩০ মে রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় যুব উৎসব। উৎসবে অংশগ্রহণকারী নাট্যদলগুলি জুন মাসের শেষে একটি ফেডারেশন গড়ার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। এর ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের জুনে 'সারা বাংলা নাট্য সন্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, নির্মল ঘোষ, চারুপ্রকাশ ঘোষের মতো গণনাট্যের শিল্পীরাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও খাতায় কলমে সংঘ সভাপতি এবং নির্মল ঘোষ সংঘ সম্পাদক। তৎকালে ভঙ্গর

ও সিপিআই(এম)-এর পক্ষপাতী গণনাট্য সংঘকে পাশ কাটিয়ে এঁরা নতুন ধাঁচের গণসংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৯৬৫-র আগস্টে সেই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন 'রূপান্তরী'র জোছন দন্তিদার, 'উত্তরী'র নির্মল ঘোষ, এলটিজি-র উৎপল দত্ত, 'লোকসংস্কৃতি সংঘ'-এর শেখর চট্টোপাধ্যায় ও 'ম্যাস থিয়েটার'-এর জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।^{১৫২} এঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়, গণনাট্য সংঘ খুব মহান, তবে বর্তমানে বিপথগামী হয়েছে, তাই নতুন সংগঠন চাই।^{১৫৩}

'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'-র প্রতিষ্ঠার যুক্তি গণনাট্য সংগঠকদের আরও দৃঢ়ভাবে সংঘকে পুনর্গঠিত করার প্রেরণা জোগায়। শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরও অনেকের মনে হয়েছিল,

"গণনাট্য সংঘ মহান ভালো কথা, কিন্তু তার মহান শবদেহের ওপর দিয়ে অন্য সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা ভালো লাগেনি অনেকেরই, তাই আবার গণনাট্য সংঘ পুনর্গঠনের কাজেই লেগে পড়া গেল।"^{১৫৪}

১৯৬৫-র জানুয়ারিতে ৬৪/এ লোয়ার সার্কুলার রোডে সিপিআই(এম)-এর একটি সভা থেকে গণনাট্য সংঘ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সংঘকে নির্দেশ দেওয়া হয় ভারতরক্ষা আইনে বন্দী পার্টিকর্মীদের মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয়া ভূমিকা নিতে। ১৭ জুলাই টিপু দাশগুপ্তের বাড়িতে সংঘের একটি ঘরোয়া আলোচনাসভায় সিপিআই(এম)-এর জ্যোতি বসু ও আবদুল হালিম যোগদান করেন।^{১৫৫} কিন্তু জ্যোতি বসু গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় পুনর্গঠনের কাজ সামান্য থমকে যায়। ২৯ জুলাই শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে ২৪ পরগণা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি তৈরি হয় এবং জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।^{১৫৬} এই কনভেনশনে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল ঘোষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। দিগিন্দ্রচন্দ্র তখনও সংঘ সভাপতি ও নির্মল ঘোষ সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু চিন-ভারত যুদ্ধের সময় দিগিন্দ্রচন্দ্র সংঘের 'আদর্শ বিরোধী' নাটক রচনা করেন এবং সেই বিপদকালে সংঘের পাশে দাঁড়াননি। অন্যদিকে নির্মল ঘোষ ছিলেন 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'র অন্যতম উদ্যোজা।

আমন্ত্রণ না জানানোর প্রক্রিয়াকে দিগিন্দ্রচন্দ্র 'অগণতান্ত্রিক' বলেছিলেন।^{১৫৭} কনভেনশন থেকেই গণনাট্য সংঘের নবপর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৬৫-র দ্বিতীয়ার্ধ থেকে জেলাগুলিতেও কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন শুরু হয়। নতুন করে নাট্যপ্রযোজনা শুরু হয়। ফেব্রুয়ারিতে সাম্প্রতিক শাখা অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিবঠাকুরের দেশে' অভিনয় করেছিল। মার্চ মাসে সীমান্তিক শাখা দমদমে একটি নাট্যোৎসব আয়োজন করেছিল। সীমান্তিক শাখা অভিনয় করে 'প্রস্তাব', চিররঞ্জন দাসের 'মৃত্যুহীন' ও উৎপল দত্তের 'দ্বীপ'। এছাড়া অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিবঠাকুরের দেশে' (প্রযোজনা সাম্প্রতিক শাখা), লেডি গ্রেগরির 'রাইজিং অফ দ্য মুন' অবলম্বনে বারীন রায়ের 'চাঁদনী রাত' ও আমন্ত্রণমূলকভাবে 'নান্দীকার'-এর 'নানারঙের দিন' নাটকগুলিও অভিনীত হয়েছিল।^{১৫৮} ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার ভিয়েতনাম দখলের প্রতিবাদে ১৪ জুলাই কলকাতায় মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে সীমান্তিক শাখা চিররঞ্জন দাসের 'ভিয়েতনাম' নাটকটি অভিনয় করে। নাটকটি সীমান্তিক শাখা দ্বারা ১৭৮ বার মঞ্চস্থ হয়েছিল। হিন্দি, ভোজপুরি, অসমিয়া, ওড়িয়াতেও নাটকটি অনুদিত হয়েছিল।^{১৫৯} সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে কলকাতার এবিটিএ হলে গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিনীত হয় চিররঞ্জন দাসের 'ভিয়েতনাম' ও শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণার দেশে'। নভেম্বরে সাম্প্রতিক শাখা দমদমের পেয়ারাবাগানে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অভিনীত হয় 'সীমান্তিক'-এর 'ভিয়েতনাম' ও 'মৃত্যুহীন', রহড়া শাখার গুপ্তবিদ্যা (দুলেন্দ্র ভৌমিক), 'সাম্প্রতিক'-এর 'ইঙ্গিত' (কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী) ও গোয়েন্দা (অনুবাদ সুমন্ত চক্রবর্তী)।^{১৬০} সীমান্তিক, দেশবন্ধুনগর, রহড়া, ব্যারাকপুর, সাম্প্রতিক ও চারণ সাহিত্যচক্র এই ছটি শাখার আয়োজনে নভেম্বর-ডিসেম্বর জুড়ে চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানে 'গণনাট্য উৎসব' চলতে থাকে। কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে গণনাট্য সংঘ তখন তাদের হারানো জমি ফিরে পেয়েছে, রাজ্যের বাকি জেলাতেও শাখা বিস্তারের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৬৬-র এপ্রিলে রাজ্য কমিটি গঠন ও ডিসেম্বরে রাজ্য কনভেনশন আয়োজনের মাধ্যমে গণনাট্য সংঘের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে নতুন করে খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। এবার আর শুধুমাত্র কলকাতা নয়, সারা বাংলার বুকে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। বসিরহাটে খাদ্যের দাবিতে অবস্থানরত কিশোর ছাত্র নুরুল ইসলাম পুলিশের গুলিতে মারা যায়। ১৯৬৭-র মার্চে সিপিআই(এম) ও বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। ফলে গণনাট্য সংঘের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। ১৯৬৭-র আগস্টে সংঘের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনের পর পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। নবপর্যায়ে সভাপতি হন কালীবিলাস ভট্টাচার্য ও সাধারণ সম্পাদক শিশির সেন। সিপিআই(এম)-এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলে সংঘের পরিচালন পদ্ধতি, নাট্য-আদর্শ ও নাটক নির্বাচনে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আসে। ১৯৭০ সালে সিপিআই-এর নিজস্ব সাংস্কৃতিক সংগঠন ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ বা আইপিসিএ গড়ে ওঠে। সভাপতি হন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক পানু পাল।^{১৬১}

আলোচ্য সময়কালে গণনাট্যের সাংগঠনিক ইতিহাস আলোচনার পর স্পষ্ট যে শুধু বাংলা নাটক ও নাটমঞ্চের ইতিহাসে নয়, গণনাট্য সংঘ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসেও। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত গণনাট্য সংঘের নাটকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করব।

তথ্যসূত্র :

- ১। অঞ্জন বেরা; পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, গণনাট্য প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ- ৩৪-৩৬
- ২। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদনা); মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৯৬০, পৃ-উনচল্লিশ
- ৩। চিন্মোহন সেহানবীশ; ৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, সেরিবান, ২০১৫, পৃ- ৩২

৫। তদেব, পৃ- ১৩৩

৬। তদেব, পু- ১৩৮

৭। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পূ- ৩৩

৮। প্রাগুক্ত, ৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, পূ- ৩৯

৯। প্রাগুক্ত, Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, প্- ১৭৬

১০। বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা (সম্পাদনা); ভূপতি নন্দীর সাথে সাক্ষাৎকার, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৯৩, পু- ৮৫

১১। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পূ- ৪২

১২। তদেব, পৃ- ৪৫

১৩। প্রাগুক্ত, Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, পৃ- ২৫৩

১৪। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃ- ৪৯

১৫। প্রাগুক্ত, ভূপতি নন্দীর সাথে সাক্ষাৎকার, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ৮৫

১৬। বিজন ভট্টাচার্য; নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪, চরিত্রলিপি, পৃ- ৩১

১৭। প্রাগুক্ত, গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় সম্মেলন দলিল, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৩৪

১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য; নবান্ন প্রসঙ্গে, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ৩, ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদনা), নতুন

পরিবেশ প্রকাশনী, ১৯৫৮, পৃ- ১৭৫

১৯। প্রাগুক্ত, নবান্ন, পৃ- ১৭

২০। শম্ভু মিত্র; সন্মার্গ সপর্যা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১০১ ২১। সজল রায়চৌধুরী; গণনাট্য কথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৬ ২২। প্রাগুক্ত, Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, পৃ- ২৪৮ ২৩। অনিল মুখোপাধ্যায়; বাংলা থিয়েটার ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, অনুষ্টুপ, এপ্রিল ২০১৬, পৃ- ৮৭ ২৪। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পৃ- আটান্ন

- ২৫। সুমিত সরকার; আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৩, পৃ-৩৬৩-৩৬৪
- ২৬। অমলেন্দু সেনগুপ্ত; উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, প্রতিভাস, ২০০৬, পৃ- ৩৯
- ২৭। ভানুদেব দত্ত; অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, মনীষা, ২০১৫, পৃ-
 - ৯৩
- ২৮। প্রাগুক্ত, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ- ৩৬৬
- ২৯। ফণিভূষণ ভট্টাচার্য; নৌবিদ্রোহ, বুকস অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যলস, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পু- ১০৬
- ●○ | R.C Majumdar; History of the Freedom movement in India, Vol. 3, Firma,

K.L., Calcutta, 1963, p- 743

- ৩১। প্রাগুক্ত, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ- ৩৭১
- ৩২। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; দেশভাগ-দেশত্যাগ, অনুষ্টুপ, ২০২০, পৃ- ১৭
- ৩৩। প্রাগুক্ত, Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, পৃ- ২০৬
- ৩৪। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ৬১-৬২
- ৩৫। সুধী প্রধান; গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯২, পৃ- ৭৫
- ৩৬। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ৫৮
- ৩৭। প্রাগুক্ত, Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, পৃ- ২৯৪-৩০৪
- ৩৮। প্রাগুক্ত, অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, পৃ- ১০৬
- ৩৯। দিলীপ গুহ; স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলন (১৯৪৭-৬২), তিন দশকের
 - গণআন্দোলন, অনিল আচার্য (সম্পাদনা), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ- ৭৯
- ৪০। প্রাগুক্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ- ২০৮
- ৪১। প্রাগুক্ত, তিন দশকের গণআন্দোলন, পু- ৮২
- ৪২। প্রাগুক্ত, অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, পু- ১১২
- ৪৩। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পূ- ৭২

200

৫৯। প্রাগুক্ত, ৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, পৃ- ৭৯

৫৮। প্রাগুক্ত, সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা,

৫৭। প্রাগুক্ত, গুরুদাস পাল; জীবন ও শিল্প, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ১০৭

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পূ- ২০৭

৫৩। সুপ্রকাশ রায়; তেভাগা সংগ্রাম, র্য্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৯, পু- ৯

৫৬। তদেব, পু- ২৮২

৫৫। প্রাগুক্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ- ২৩০

200

৫৪। প্রাগুক্ত, তরুণ রায়; তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি, তিন দশকের গণআন্দোলন, পৃ- ১৩২-

দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ৮৯

2030, 7- 60 ৫২। প্রাগুক্ত, সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য,

৫০। তদেব, পু- ৭৬ ৫১। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); এবারকার ফসল-মজুরি ও জমির সংগ্রামে বিপ্লবী কৌশল, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ষষ্ঠ খণ্ড, মনীষা, সেপ্টেম্বর

৪৭। তদেব, পু- ৩৫৬ ৪৮। প্রাগুক্ত, অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, পৃ- ১১৪ ৪৯। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ৬৭

৪৬। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, ১৯৭৮, পু- ৩৫৩

বছর, পৃ- ৬৭

88। তদেব, পৃ- ৭৫ ৪৫। প্রাগুক্ত, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিজনের নাট্যকৃতি, গণনাট্য : পঞ্চাশ ৬০। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ৭২-৭৩

৬১। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পু- ৮২

৬২। প্রাণ্ডক্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস; গণনাট্য সম্মেলন, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ৩, পৃ- ৪৪২

৬৩। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃ- ৮৯

- ৬৪। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ৩, পৃ- ৪৪০-৪৪২
- ৬৫। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ৭৭
- ৬৬। প্রাগুক্ত, রিভিউ রিপোর্ট ১৯৫৫, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পু- ২৫৪
- ৬৭। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ৭৪

৬৮। তদেব, পৃ- ৭৬

- ৬৯। সুনীল দত্ত; গণনাট্য সঙ্ঘ নয়ানপুর, নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭, পৃ- ৪০
- ৭০। প্রাগুক্ত, গণনাট্য সঙ্ঘ/জনান্তিক সংকেত, নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, পৃ- ৪২
- ৭১। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ৮৫
- ৭২। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃ- ৯৬
- ৭৩। প্রাগুক্ত, সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা,

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ২১১

৭৪। প্রাগুক্ত, ভারতের জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান

কর্তব্য, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ- ১৯০

৭৫। মণিকুন্তলা সেন; সেদিনের কথা, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ- ২১৩

৭৬। প্রাণ্ডক্ত, সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা,

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ১৭৯

৭৭। প্রাণ্ডক্ত, অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, পৃ- ১৩৮

- ৭৮। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির প্রস্তাব, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, সপ্তম খণ্ড, মনীষা, মে ২০১১, পু- ৩৫
- ৭৯। প্রাগুক্ত, প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিকে, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, সপ্তম খণ্ড, পৃ- ১৭
- ৮০। প্রাগ্তক্ত, নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পূ- ৪৩৯
- ৮১। তদেব, পৃ- ৪৩৭
- ৮২। সুনীল দত্ত; স্রোতের বিরুদ্ধে ঋত্বিক, নাট্যস্মৃতি : পঞ্চাশ বছর, প্রথম পর্ব, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৬, পৃ- ৬৩
- ৮৩। সুরমা ঘটক; মুখবন্ধ, অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট, ঋত্বিক ঘটক (অনুবাদ- রথীন চক্রবর্তী), নাট্যচিন্তা, ২০০৩, পৃ- ১২
- ৮৪। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১১৭
- ৮৫। তদেব, পৃ- ৮৬
- レリー Utpal Dutta; Towards A Revolutionary Theatre, M. C Sarkar & Sen Private Ltd, Calcutta, 1995, p- 33
- ৮৭। প্রাগুক্ত, গণনাট্য সঙ্ঘ/ভাঙ্গা বন্দর, নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, পৃ- ৪৪
- ৮৮। প্রাগুক্ত, গণনাট্য আন্দোলনের জ্বলন্ত প্রতিভা সলিল চৌধুরী, নাট্যস্মৃতি : পঞ্চাশ বছর, প্রথম
 - পর্ব, পৃ- ৫১
- ৮৯। প্রাগুক্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য; কেন নাটক? কার জন্য নাটক?, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পু-

202

৯০। মণীন্দ্র মজুমদার; নাগপাশ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রকাশনা, ১৯৫২, ভূমিকাংশ ৯১। সুরমা ঘটক; ঋত্বিক পদ্মা থেকে তিতাস, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ- ২৬ ৯২। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১২৫-১২৬

৯৩। প্রাগুক্ত, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বিগত ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্ভেন্সনে গৃহীত সাংগঠনিক নিয়মাবলি, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৩৭-২৩৮

৯৪। প্রাগুক্ত, গণনাট্য সঙ্ঘ/দলিল, নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, পৃ- ৫১-৫২

৯৫। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃ- ১০৮ ৯৬। প্রাগুক্ত, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সর্বভারতীয় কমিটি, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৩৯ ৯৭। প্রাগুক্ত, ১৯৫৩ সালে ৬-১২ এপ্রিল বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সপ্তম

সর্বভারতীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলি, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৫১ ৯৮। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃ- ১১০ ৯৯। প্রাগুক্ত, 'আইপিটিএ-র কি প্রয়োজন আছে?', গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৪৭ ১০০। প্রাগুক্ত, গণনাট্য সজ্য/হরিপদ মাস্টার, নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, পৃ- ৮৭ ১০১। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১৩৮

১০২। প্রাগুক্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়; গণনাট্য সংঘের কটি বিশেষ প্রযোজনা প্রসঙ্গে, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ১৭১

১০৩। প্রাগুক্ত, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন ১৯৫৫, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ-২৮৫

১০৪। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃ- ১১১-১১২ ১০৫। প্রাগুক্ত, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৩৮ ১০৬। তদেব, পৃ- ২৫৭

১০৭। সুধী প্রধান; গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকটি অতীত প্রসঙ্গ, গণনাট্য ৩ বর্ষ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৬৭, পৃ- ১৭

১০৮। প্রাগুক্ত, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন ১৯৫৫, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ-২৮৫

- ১০৯। প্রাগুক্ত, সংযোজন, অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট, পৃ- ৯৬
- ১১০। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১৪৮
- ১১১। প্রাগুক্ত, অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, পূ- ১৬৩
- ১১২। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১৬৮
- ১১৩। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); পশ্চিমবঙ্গে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্টের খসড়া কর্মসূচি, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ- ৩৪০
- ১১৪। তদেব, পৃ- ৩৪৯
- ১১৫। দীপক মিত্র; ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তথ্য সংকলন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬, পৃ- ১৬৭
- ১১৬। প্রাগুক্ত, অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, পৃ- ১৭৪
- ১১৭। তদেব, পৃ- ১৭৭
- ১১৮। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১৭২
- ১১৯। বীরু মুখোপাধ্যায়; সংক্রান্তি, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, ভূমিকাংশ
- ১২০। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১৭৫

১২১। তদেব, পু- ১১৫

- ১২২। শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়; ২৪ পরগণা জেলার গণনাট্য আন্দোলন : ইতিহাসের রেখাচিত্র, প্রসঙ্গ গণনাট্য, গণমন প্রকাশন, মার্চ ১৯৮১, পু- ১১৫
- ১২৩। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১৭৯-১৮০
- ১২৪। প্রাগুক্ত, শিবাজীপ্রতিম বসু; বাম-জনপ্রিয় আন্দোলনের এক নির্ণায়ক মুহূর্ত ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন, তিন দশকের গণআন্দোলন, পৃ- ২৩৫
- ১২৫। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১৮৭
- ১২৬। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যোৎসব ১৯৬০, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পু- ২৮৬

202

১৪২। প্রাগুক্ত, জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত ব্রিটিশ সরকারকে লিখিত ডাঙ্গের পত্রাবলি, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, পু- ২৮৪

১৪০। প্রাগুক্ত, অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, পূ- ২২৪ ১৪১। প্রাগুক্ত, পৃথ্বীরাজ; পার্টির সামনে গুরুতর সংকট, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, পূ- ১৬৫

১৩৮। প্রাগুক্ত, সেদিনের কথা, পু- ২৭৪ ১৩৯। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); দ্বন্দ্বে দীর্ণ দিনগুলি, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ- ১৫৩

প- ১৩৪

১৩৫। তদেব, পু- ১২৪ ১৩৬। প্রাগুক্ত, অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, পূ- ১৬৬ ১৩৭। প্রাগুক্ত, পার্টি চিঠি ৩, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড,

প- ১১৫-১১৬

১৩৩। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, অষ্টম খণ্ড, মনীষা, জানুয়ারি ২০১২, পু- ৫১২ ১৩৪। প্রাগুক্ত, পার্টি চিঠি ৩, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড,

প- ১৩৬

১৩০। প্রাগুক্ত, অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, পূ- ২২০ ১৩১। দিলীপ ঘোষাল; গণনাট্য কী ও কেন, গণমন প্রকাশন, ২০০৭, পৃ- ১২৩ ১৩২। প্রাগুক্ত, পার্টি চিঠি ৩, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড,

১২৯। প্রাগুক্ত, শুরুর দিনগুলো (১ম পর্ব), প্রসঙ্গ গণনাট্য, পু- ৯১

১২৮। তদেব, পু- ২০৪

১২৭। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ২০১

- ১৪৩। সম্পাদকীয়, দেশ, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৬, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬২
- ১৪৪। প্রাগুক্ত, শুরুর দিনগুলো (১ম পর্ব), প্রসঙ্গ গণনাট্য, পু- ৯২

১৪৫। তদেব, পৃ- ৯২

১৪৬। তদেব, পৃ- ১১৫

- ১৪৭। প্রাগুক্ত, বাবলু দাশগুপ্ত; গণনাট্যের নাটক : রচনা প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২০৩
- ১৪৮। প্রাগুক্ত, গণনাট্য : সেকাল একাল, প্রসঙ্গ গণনাট্য, পৃ- ১৬১
- ১৪৯। প্রাগুক্ত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ দশম রাজ্য সম্মেলন, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃ- ৪১০
- ১৫০। প্রাগুক্ত, গণনাট্য : সেকাল একাল, প্রসঙ্গ গণনাট্য, পু- ১৬১
- ১৫১। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃ- ১৩০

১৫২। তদেব, পৃ- ১৩২

১৫৩। প্রাগুক্ত, শুরুর দিনগুলো (১ম পর্ব), প্রসঙ্গ গণনাট্য, পৃ- ৯৮

১৫৪। তদেব, পৃ- ৯৮

- ১৫৫। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কী ও কেন, পু- ৪৪
- ১৫৬। প্রাগুক্ত, শুরুর দিনগুলো (১ম পর্ব), প্রসঙ্গ গণনাট্য, পু- ৯৮

১৫৭। প্রাগুক্ত, নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, পৃ- ৩৬৫

১৫৮। প্রাগুক্ত, নবপর্যায়ে ২৪-পরগণা জেলার গণনাট্য সংঘের প্রযোজনা, প্রসঙ্গ গণনাট্য, পূ- ১২৪

- ১৫৯। প্রাগুক্ত, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ ও আমরা, প্রসঙ্গ গণনাট্য, পূ- ১৩৯
- ১৬০। প্রাগুক্ত, শুরুর দিনগুলো (১ম পর্ব), প্রসঙ্গ গণনাট্য, পৃ- ১০০
- ১৬১। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পূ- ১৫৩